## তৃতীয় অধ্যায়

## কৃত্তিবাসের স্থান কাল জীবনকথা ও রামায়ণ বিশ্লেষণ

### (ক) কৃত্তিবাসের জীবনকথা

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের তথা পাঁচালী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস ও কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে মধুসূদন কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর অনুসারী পাঁচজন কবির নাম করেছেন – ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস, মুরারি ও কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি | এ বঙ্গের অলংকার।

কিন্তু বঙ্গের অলংকার কীর্তিবাস কবি কৃত্তিবাস কবি কৃত্তিবাসের জীবনকথা - কবির ভণিতা, বা পুথির পুষ্পিকা থেকে, প্রাচীন অন্যান্য কবির মতো পুরাটা সংগ্রহ করা যায়নি। অধিকন্তু বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর এত বেশি এবং লিপিকারদের, তদুপরি গায়নদের - কলমে ও গানে তা পল্লবিত হয়েছে এত বেশী যে কোনটা কৃত্তিবাসের রচনা, কোনটা গায়নদের বা কোনটা লিপিকার প্রক্ষেপ তা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রাচীন কবির লেখায় এই বিড়ম্বনার কথা সুবিদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা অন্যান্য স্থানে সংগৃহীত যে সব পুথি – (যা প্রায় সবই খন্ডিত) – পাওয়া যায় এবং যে সব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যে ছোট ছোট কবি পরিবার আছে, তার নমুনা এইরকম – (ক)

১. কৃত্তিবাস পন্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।

২. রাঢ়া কুলে ঘর ওঝার রত্ন না সে পুরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চাপিয়া বহেন গঙ্গা সুরেশ্বরী॥
ফুলিয়া নগর সর্বলোকেতে বিদিত।
সেখানে বসেন কীর্তি বাসপন্ডিত॥

৩. মুখটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস পন্ডিত॥

৪. পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে ।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর ।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥

৫. ছোটর বন্দ বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার ।
তথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥
রাঢ়া মধ্যে বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি ।
যার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥

৬. কৃত্তিবাস পন্ডিত রাজসভায় পূজিত ।
যাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ গীত ॥
... ... ...
কির্তিবাস পন্ডিতের সকল গোচর ।
নানা রত্ন দিয়া যারে পূজে গৌড়েশ্বর ॥

এইসব পুঁথি এক করলে জন্মস্থান, পিতামহ, পিতা-মাতা, ছয় সহোদর, অধ্যয়ন স্থান, আচার্য গৌড়েশ্বরের সভায় সম্মাননা — ইত্যাদি পাওয়া যায় ।

তারপর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আবিষ্কৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অংশটির প্রকাশের পর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিচয় সুলভ হয় । প্রথম এর খানিকটা প্রকাশিত হয় নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম খন্ডে ১৩০৫ সালে । দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) এবং রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর গ্রন্থে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন । হারাধন দত্ত নাকি ১৪৩২ শকাব্দে (খ্রী. ১৫১১) লেখা একটি পুঁথি থেকে এই বিবরণী টুকে নিয়েছিলেন । কিন্তু পুঁথিটি পরে আর পাওয়া যায় নি । নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুসন্ধানে নাকি আত্মবিবরণীর আরও অনুলিপি পাওয়া গিয়েছিল । যাহোক এই বিবরণীর অকৃত্রিমতা নিয়ে বিদগ্ধ পন্ডিতগণ একমত হতে পারেন নি । আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন যে এটি "কোন কুলজী বিশারদ গায়েনের সংযোজন ।"(১৮) যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই বিবরণীর প্রামান্য স্বীকার করেন । ভট্টশালী প্রমুখ পন্ডিতগণ এর আংশিক সত্যতা মেনে নিয়েছেন ।

পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এবং দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আত্ম-বিবরণীতে সম্পূর্ণ উল্লিখিত সুদীর্ঘ বিবরণটি –

পূর্বেতে আছিল শ্রী দনুজ মহারাজা ।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥ ইত্যাদি

এবং রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥ ইত্য-ত মোট

৭৬টি পয়ার শ্লোকে রচিত ।

দনুজ মহারাজার পাত্র নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে অস্থিরতা দেখা দিলে, দেশ ছেড়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে এলেন এবং ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করলেন ।

গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি ।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী ॥

তাঁর এক পুত্র হল গর্ভেশ্বর । গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র – মুরারি, সূর্য, গোবিন্দ । মুরারির সাত পুত্রের একজনের নাম বনমালী । বনমালীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা ।

মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী ।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
*** *** ***
আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস ।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

অতঃপর বৎসরান্তে – ' বার বৎসরে "পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ।"

বৃহস্পতিবার উষা পোহালে শুক্রবার ।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥

গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে অনুমতি নিয়ে এলেন কৃত্তিবাস – ইচ্ছা "রাজপন্ডিত" হবেন । পাঁচটি শ্লোক লিখে দ্বারীকে দিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । পরে ডাক এল ।

রাজসভায় প্রবেশ করে কৃত্তিবাস দেখলেন –

সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে ।।
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।
পাত্রমিত্র সনে রাজা পরিহাস মন ।।
গন্ধর্বরায় বসে আছে গন্ধর্ব অবতার ।
রাজসভা পূজিত তেঁহ গৌরব অপার ।।

রাজার আদেশে সাত শ্লোক পড়লেন কৃত্তিবাস –

নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভাত ।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চাত ।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল ।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুস্পমাল ।।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া ।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ।।

রাজা পুরস্কার প্রার্থনা করতে বলায় কৃত্তিবাস বললেন –

কারো কাছে নাহি লই করি পরিহার ।
যথা যাই তথাত গৌরব মাত্র সার ।।
*** *** ***
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ।।

চন্দনাদি ভূষিত কৃত্তিবাস বাহির হইলে ধন্য ধন্য করে অনুগমন করল সবাই –

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি ।
পন্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহা গুণী ।।
বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকান্ড গান ।।

এই হল আত্মবিবরণীর সার কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে — জন্মের মাস, বার তিনি উল্লেখ করলেন কৃত্তিবাস, কিন্তু সনের উল্লেখ নেই কেন ? আর গৌড়েশ্বর কে ? কেন তাঁর নাম বললেন না কবি ? এইখানে জট পাকিয়ে গেছে এবং তর্ক তুমুল হয়ে দেখা দিয়েছে।

মূল প্রশ্ন দুটি — কৃত্তিবাস কখন, কোন সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং কোন রাজার সভায় উপস্থিত হয়ে তার আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। এক দিক থেকে দুটি নয় একটিই আসল প্রশ্ন কৃত্তিবাসের কাল নির্ধারণ। গৌণ প্রশ্ন — কৃত্তিবাস কোথায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, বেঁচেছিলেন কতদিন ইত্যাদি।

এ নিয়ে বহুকাল ধরে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। "আদিত্য বার শ্রী পঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এবং পাঠান্তর "পুণ্য মাঘ মাস" ধরে জ্যোতিষ্ক গণনা করে সময় নিরূপণের চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ মুখ্যত: যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। পূর্ণ মাঘ মাস অর্থাৎ ২৯শে কি ৩০শে মাঘ ধরে প্রথম গণনা করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ১২৫০ শক থেকে ১৩৫০ শক পর্যন্ত এক শত বৎসরের মধ্যে সংক্রান্তিতে রবিবার শ্রী পঞ্চমী তিথি পড়েনি। (খ) তারপর মত পরিবর্তন করে লেখেন যে ১২৫৯ শকের ৩০শে মাঘ ও ১৩৫৪ শকের ২৯শে মাঘ এই যোগ ঘটতে পারে। (ঘ) অত:পর তিনি ১৩৫৪ শকের ২৯শে মাঘ রবিবার, (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) কৃত্তিবাসের জন্ম দিন ধার্য করেন। অবশ্য এই অবধারন সকলে মেনে নেন নি।

এবার গৌড়েশ্বরের কথা। তিনি কি রাজা গণেশ, না তাঁর পুত্র যদু জালালুদ্দিন না মহেন্দ্রদেব, দনুজমর্দন দেব ? না, শাহাবউদ্দীন বায়জিদ না রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ? কিংবা কংসনারায়ণ ? এই বিচারে গৌড়ের শাসকদের সময় নির্ধারণ, মুদ্রা এবং পাত্রগণের কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, প্রভৃতির যথাযথকরণ, "পূর্ণ মাঘ" বা "পুণ্য মাঘ", 'দেবানুজ' অথবা যে দনুজ এই সব পাঠান্তর নিয়ে বহু পন্ডিত যাঁর যাঁর মত ও যুক্তি নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। কোন গৌড়েশ্বরের রাজসভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়েছিলেন প্রমাণিত হলেই কবির যথার্থ সময় নিরূপিত হবে। এই বিষয় নিয়ে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু,

চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হারেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক যমীন্দ্রমোহন বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, নিখিলনাথ রায়, অধ্যাপক ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তরঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, অমিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্য ইতিহাস লেখক ও বিখ্যাত বহু পন্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করেছেন এবং বলা বাহুল্য যে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। বিস্তৃত যুক্তি প্রমাণ বাদ দিয়ে আমরা কয়েকজনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

(১) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন – "গুণরাজ খান উপাধিযুক্ত মালাধর বসুই বাঙ্গালার আদিকবি এবং তৎপ্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থই বঙ্গভাষার আদিকাব্য ১৩১৫ শকে আরব্ধ হইয়া ১৪০২ শকে কাব্য রচনা সমাপ্তি হইয়াছিল। মালাধর বসু আদি শূরবংশীয় কায়স্থ পঙ্‌ক্তির অন্যতম দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লেখকের মতানুসারে কৃত্তিবাস যদি মুরারির পৌত্র হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীহর্ষ হইতে নিম্নতন দ্বাবিংশ পুরুষ। সুতরাং কৃত্তিবাস মালাধর অপেক্ষা অনেক আধুনিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (৬)

(২) রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন – "চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পাঁচ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪০২ শকে মেলবন্ধন হইয়াছিল; সে সময়ে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন না। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হইয়াছে ধরিয়া লইলেও চৈতন্যদেবের ৬৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৪২ শকে (১৪২০ খৃঃ অব্দে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন বলা যাইতে পারে।" (৮)

(৩) যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন – "তাঁহার সমকালীন ঘটনাসমূহ বিচার করিলে ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।" (৯)

(৪) চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – "রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিত হইয়াছে ১৪৪০ খৃঃ অব্দে কিংবা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম। অতএব দীনেশবাবুর মতে কৃত্তিবাসের

জন্ম শকাব্দা ১৩৬২ বা তাহার দু'দশ বৎসর এদিক ওদিক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন ১২৫৭ শকাব্দায় কৃত্তিবাসের জন্ম। অর্থাৎ দীনেশবাবুর অনুমানের শতাধিক বর্ষ পূর্বে। এই সংখ্যা পত্রিকাতেই শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া 'কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য' প্রকাশ করিয়া বলেন, কৃত্তিবাস ১৩৩০ হইতে ১৩৩৫ শকাব্দার মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।" (জ)

(৫) অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন — "যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা করিয়া প্রথমত: নির্ণয় করিয়াছিলেন যে কৃত্তিবাস ১৩৫৪ শকে ২৯শে মাঘ (১৪৩২ খৃ: ১১ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩, পৃ: ৩১৭)। পরে তিনি 'পূর্ণ' শব্দকে 'পুণ্য' শব্দ রূপে গ্রহণ করিয়া গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস ১৩২০ শকের ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিনে জন্মগ্রহণ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (তৎকর্তৃক সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা     পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উভয়ের মধ্যে ৩৪ বৎসরের ব্যবধান। *** *** *** ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্বে কংস নারায়ণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন (মধ্যযুগের বাঙলা, পৃ: ১১, ২৫, ২৯ এবং গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৩ দ্রষ্টব্য)। তখন কংস নারায়ণের সম্পর্কান্বিত এবং সাময়িক ব্যক্তিগণের উল্লেখ আমরা আত্মবিবরণীতে পাইতেছি। তখন এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, কৃত্তিবাস যদি কাহারও নিকট হইতেই রামায়ণ রচনার নির্দেশ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে কংসনারায়ণের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। ইহাকে গৌড়েশ্বর রূপে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না বলিয়াই বোধহয় তিনি আত্মবিবরণীতে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই।" (ঝ)

(৬) নিখিলনাথ রায় লিখেছেন — "এই তিনজন হিন্দু গৌড়েশ্বরের মধ্যে কাহার দরবারে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন আমরা এখন তাহার-ই আলোচনা করিব। *** *** *** গণেশের সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। *** *** সুতরাং মহেন্দ্রদেব অথবা দনুজমর্দনের মধ্যে কাহারও সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। *** *** সুতরাং কৃত্তিবাসের দনুজমর্দনের

সভায় উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। ••• ••• আমরা যেরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম, তাহাতে কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, আর তিনি যে রাজার সভায় উপস্থিত রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন তাঁহাকে পাণ্ডুনগরাধিপ দনুজমর্দনদেব-ই বলিয়া বোধ হয়।" (৭)

(৭) অধ্যাপক ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন "উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে খুব সম্ভবত: কৃত্তিবাস তরুণ বয়সে গৌড়েশ্বর জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের সভায় গমন করেন এবং তাঁহার-ই আজ্ঞায় রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচনা করেন।" (৮)

(৮) সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "এই গৌড়েশ্বর কে ? আমার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯ - ৭৪)।" (৯)

(৯) ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — "তিনি কোন গৌড়েশ্বরের সভাতে গিয়েছিলেন ? ••• ••• নানা রকম মতভেদ আছে সুতরাং তিনি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোন গৌড়েশ্বরের সভাতে গিয়ে সম্মান পেয়েছিলেন তার ঐতিহাসিকতা আমরা নির্ধারণ করতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হই নি। নানা অনুমান মাত্র করতে পারি। নিশ্চয় কোন সন তারিখ আমরা বলতে পারিনা। এইটুকু বলতে পারি — চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর আবির্ভাব হয় এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় লেখার আগে তাঁর রামায়ণ লেখা হয়। ••• ••• কৃত্তিবাস গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে রামকথা লিখতে সুরু করলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বোধ করি ভারতীয় ভাষায়। এটাই বাল্মীকির দ্বিতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ তামিল ভাষায় কম্বনের রামায়ণ।" (১০)

গৌড়েশ্বর কে ছিলেন কৃত্তিবাসের উৎসাহদাতা — সে সম্বন্ধে মতৈক্য হয় নি কাজেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের সঠিক কাল সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা আছে। তবে এ কথা বোধ হয় সর্বসম্মত যে কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব কবি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর আরও কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক আছে। কে ছিলেন তাঁর গুরু ? "পাঠের নিমিত্ত গেলাম

বড় গঙ্গা পার।" – এই বড় গঙ্গা কোন নদী ? নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এবং অভিমত-দর্ভের ক্ষেত্রে এ আলোচনা অনিবার্য নয় ও খানিকটা প্রসঙ্গ বহির্ভূত মনে করে – জীবনী বা ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উদ্ধার করে এবং কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব এবং নিকট পক্ষে অন্তত: পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের কবি এটি স্থির করে প্রসঙ্গের ইতি করা যাক।

(খ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ

মধ্যযুগের সাহিত্য মাত্রেই পদ ও পাঁচালী এবং মুখ্যত: তা শ্রব্য ও গেয়। পুথি নকল করে করে নিয়ত গায়নরা পালাগান করত এবং সকলে শুনত। এই ছিল সাহিত্য রসাস্বাদনের একমাত্র পন্থা। যে বিষয় যত জনপ্রিয় হোতো - তার পুথির নকলও হতো বেশি। আর লিপিকারগণ না বুঝে, কখনো বা বুঝেও নিজের কবিত্ব ফলানোর জন্য নতুন শব্দ, কথা, শ্লোক যোগ করে দিতেন ফলে পাঠান্তর বাড়ত, গায়নরাও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে নতুন বস্তু আমদানী করতেন। এইভাবে পুথির পাঠান্তর বাড়তে বাড়তে - বিষয়বস্তুর আদল থাকলেও ভাষায় কথায় মিল থাকত না। যে বিষয় যত জনপ্রিয় - তার পাঠান্তর অর্থাৎ রচনার মধ্যে পার্থক্য ততো বেশি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল রাম ও কৃষ্ণ। কানু ছাড়া গীত নাই – এই প্রবাদটি বাংলা মধ্যযুগের ও লৌকিক সাহিত্যে সঙ্গীতে পুরাপুরি সত্য। রামকথার ব্যাপ্তি ততখানি ছিল না, তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কৃষ্ণ-গীতি ও কীর্তন রামকথাকে যেন একবারে আচ্ছন্ন করে দিল। ফলে রামকথাকে নিয়ে গীত, পাঁচালি উত্তরকালে কৃষ্ণকথার তুলনায় নগণ্য। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর বিষয় গৌরব ও একান্ত ভাবে পারিবারিক সুখদু:খের কথা – বাল্মীকিকে আশ্রয় করে দেশীয় রামপাঁচালী, বহু কবিকে আকৃষ্ট না করতে পারলেও একা কৃত্তিবাসের দেহবৃক্ষের বহু শাখায় প্রসারিত ছিল এবং তার অমৃত ফল এখনো বাঙালী আনন্দে আস্বাদন করে।

কৃত্তিবাসের অত্যধিক জনপ্রিয়তা এবং তার ফলে বহু পুথির লিপিতে মূল কৃত্তিবাসের রামায়ণ কোনটি বলা কঠিন। যখন প্রথম ছাপাখানা এল তখন শ্রীরামপুর থেকে আদি-অযোধ্যা-অরণ্য ও কিষ্কিন্ধ্যা – এই চার কান্ড বেরিয়েছিল ১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে - আর বাকি তিন কান্ড – সুন্দর-লঙ্কা ও উত্তরাকান্ড ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সংস্করণে নানারকমের ভুলভ্রান্তি ছিল কৃত্তিবাসের বানানটি-ই ছিল 'কীর্তিবাস'। তারপর উল্লেখযোগ্য বটতলার সংস্করণ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন — "১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বটতলা হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীরামপুরী রামায়ণের জয়গোপাল তর্কালংকার কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণ। কালে এই সংস্করণ-ই সাধারণ্যে বহুল প্রচার লাভ করে এবং ইহার প্রতিযোগিতায় অপর সংস্করণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখন দেশের সর্বত্র যে রামায়ণ পঠিত হইতেছে তাহা ঐ জয়গোপালী সংস্করণের পুনঃসংস্কার মাত্র।" তারপর মোটামুটি এই আদলেই পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর, দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে রামায়ণ সম্পাদনা করেছেন।

কাণ্ডানুসারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয় বিন্যাস এই রকম :

আদিকাণ্ড : — বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ : রত্নাকর কাহিনী, বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার জন্য নারদের নির্দেশ ও রামকথা বর্ণন, মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্যবংশ ধ্বংস এবং হারীতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, সগর বংশের ইতিহাস। সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশ নাশ, কপিল কর্তৃক সগর বংশ উদ্ধারের নির্দেশ, গঙ্গার জন্ম, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ণ, চারিধারায় গঙ্গার মর্ত্যে আগমন ও ঐরাবতের গর্ব ভঙ্গ, মহাদেবের জটায় গঙ্গা, বারাণসী মাহাত্ম্য, জহ্নুমুনির কথা, কাণ্ডার মুনির উপাখ্যান, সগর বংশ উদ্ধার, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, রঘু কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়, অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ, দশরথের জন্ম, অজ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু, কৌশল্যার সহিত দশরথের বিবাহ, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সঙ্গে বিবাহ, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি - জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা, গণেশের মুণ্ড পরিবর্তন কথা, দশরথকে শনির বরদান, দশরথের মৃগয়া, সিন্ধু বধ ও অন্ধকের অভিশাপ, সম্বর বধ, কৈকেয়ীকে বরদানের অঙ্গীকার, কৈকেয়ীকে দ্বিতীয় বরদান অঙ্গীকার, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম ও অনাবৃষ্টির জন্য লোমপাদ রাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ণ, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ, সীতার জন্ম, চরু বিভাগ, রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের জন্ম। সকলের আনন্দ ও রাবণের আতঙ্ক, বানরগণের জন্ম, দশরথের চারপুত্রের অন্নপ্রাশন - বাল্যক্রীড়া-বিদ্যালাভ, মারীচ প্রসঙ্গ, সীতার বিবাহে হরধনু

চাপের কথা ও রাজন্যবর্গের ধনুভঙ্গে ব্যর্থতা, গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রতা, দশরথের সভায় বিশ্বামিত্র, রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা, দশরথের প্রতারণা, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, রাম লক্ষ্মণের মন্ত্রদীক্ষা, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, রাম কর্তৃক তিন কোটি রাক্ষস বধ, রামের মিথিলা যাত্রা, সীতাদেবীর বর ভিক্ষা, হরধনু ভঙ্গ, রামাদির বিবাহ, চন্দ্রবংশ উপাখ্যান পরশুরামের দর্পচূর্ণ ।

অযোধ্যাকান্ড : — রামের অভিষেক প্রসঙ্গ ও অধিবাস, কৈকেয়ীকে মন্থরার কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা ও দশরথের খেদ, পিতৃসত্য পালনে রামের বনগমনে প্রস্তুতি, রামলক্ষ্মণ সীতার বনে যাত্রা । শৃঙ্গবের পুরে, সুমন্ত্রের বিদায় গ্রহণ, জয়ন্ত কাকের চক্ষুবিদ্ধকরণ, রাম চিত্রকূটে, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন, ভরতের বিলাপ - কৈকেয়ীকে ভৎসনা, শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরাকে প্রহার, দশরথের অন্ত্যেষ্টি, রামকে ফিরাবার জন্য ভরতের বনযাত্রা, রামের সঙ্গে চিত্রকূটে ভরতের সাক্ষাৎ, রাম কর্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধ, রামের পাদুকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য শাসন, দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার পিন্ডদান, ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গু নদীর প্রতি সীতার অভিশাপ ও বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্বাদ, গয়া মাহাত্ম্য ।

অরণ্যকান্ড : — চিত্রকূট অবস্থান ও অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, রামচন্দ্র দন্ডকারণ্যে, বিরাধ রাক্ষস বধ, শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রাম ও বনান্তরে গমন, অগস্ত্যাশ্রমে রাম ইল্বল - বাতাপি বৃত্তান্ত, পঞ্চবটীতে রাম, জটায়ু পরিচয়, শূর্পনখার নাসাকর্ণছেদন, রামের সঙ্গে রাক্ষসগণের যুদ্ধ, খরদূষণ বধ । রাবণের কাছে শূর্পনখা, সীতাহরণে মারীচের নিষেধ পরে মায়ামৃগ রূপ ধারণ, মারীচ বধ, সীতাহরণ, জটায়ু রাবণ যুদ্ধ, সীতাসহ লংকায় রাবণ ও অশোক কাননে সীতার স্থান, দেবগণ কর্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা । রামের বিলাপ, সীতা অন্বেষণ, জটায়ু সমাগম, জটায়ুর মৃত্যু, কবন্ধের শাপমুক্তি, শবরী উপাখ্যান ।

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড : — সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা, সীতার আভরণ প্রদর্শন, রাম-নাম মাহাত্ম্য, সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা — বালী সুগ্রীবের কলহ বৃত্তান্ত, দুন্দুভি বধ, বালীবধে ও সুগ্রীবকে রাজ্যদানে রামের প্রতিজ্ঞা । বালী বধ, তারার অভিশাপ, বালীর সৎকার ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, রামচন্দ্রের বিরহ বিলাপ, লক্ষ্মণের

দৌত্য, সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহ উদ্যম, সীতা অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ, গঙ্গা মাহাত্ম্য, উত্তরদিক থেকে বানরদের প্রত্যাগমন, রামনাম কীর্তন, দক্ষিণ পাতালে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রবেশ ; প্রায়োপবেশন, সম্পাতির সঙ্গে পরিচয়, রামনাম শ্রবণে সম্পাতির পক্ষ উদ্গম, সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান ও বানরগণের সমুদ্র লংঘন উদ্যম ।

সুন্দরা কান্ড:— সাগর উত্তীর্ণ প্রসঙ্গ, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত, হনুমানের লংকাযাত্রা, সুরসা মৈনাক প্রসঙ্গ, সিংহিকাবধ, হনুমানের লংকা প্রবেশ, চামুন্ডার লংকাত্যাগ, সীতা অন্বেষণ, অশোকবনে রাবণের আগমন, চেড়ীগণের অত্যাচার, ত্রিজটার দুস্বপ্ন, সীতা হনুমান সংবাদ, রামের অঙ্গুরীয় প্রদান, সীতার শিরোমণি দান, হনুমানের আমুবন ভঙ্গ, রাক্ষস ও অক্ষকুমার বধ, ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্দী হনুমান, হনুমানকে দন্ড, লংকা দাহণ, সীতার নিকট হনুমানের বিদায় ও কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা , মধুবন ভঙ্গ, সীতার বার্তা শ্রবণ, কপিসহ সমুদ্রতীরে রামের আগমন, রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ও বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত, বিভীষণের লংকাত্যাগ, রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রী ও বিভীষণের অভিষেক, সমুদ্রের উপাসনা ও সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উপদেশ, নল কর্তৃক সেতুবন্ধন, নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ, শ্রীরামের লংকা যাত্রা ও শিব প্রতিষ্ঠা, রামের ভস্মলোচন বধ ও লংকা প্রবেশ ।

লংকা কান্ড : — শুকসারণের রামসৈন্য দর্শন, বন্ধন ও মুক্তি, রাবণের নিকট শুকসারণের সংবাদ, শুকসারণ কর্তৃক রাবণকে রামসৈন্য প্রদর্শন, রামের শরক্ষেপ ও রাবণের পলায়ন, রাবণ কর্তৃক শুকসারণকে ভর্ৎসনা, শার্দুল চর প্রেরণ ও রামশিবিরে বন্ধন ও মুক্তি, রাবণ কর্তৃক রামের মায়ামুন্ড প্রদর্শন, সীতার বিলাপ, সরমার সান্ত্বনা, লংকার চতুর্দিকে বানর সৈন্য সংস্থাপন, দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হরপার্বতীর কলহ, অঙ্গদের রাজদ্বার রাবণের মুকুট সহ প্রত্যাবর্তন, রাবণের ঐশ্বর্য বর্ণনা, ইন্দ্রজিতের প্রথমবার যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্ধন, রামলক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন দর্শনে সীতার বিলাপ, ত্রিজটার সান্ত্বনা, নাগপাশ থেকে মুক্তি, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্তের যুদ্ধ ও মৃত্যু, প্রথমবার রাবণের যুদ্ধে গমন, বিভীষণ কর্তৃক রাবণসৈন্য পরিচয়, রাম-রাবণের প্রথম দিনের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের

সঙ্গে কথোপকথন, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যু, অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ, রাম-লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, ঔষধের জন্য হনুমানের ঋষ্যমূক পর্বতে যাত্রা, পর্বতের স্তব, ঔষধ আনয়ন - মূর্চ্ছা ভঙ্গ, রাবণ কর্তৃক লংকার দ্বার রোধ, বানরগণ কর্তৃক দ্বিতীয়বার লংকা দাহন, কুম্ভ নিকুম্ভ ও মকরাক্ষের যুদ্ধ মৃত্যু, তরণীসেন বধ, বীরবাহু-ধূম্রাক্ষ-ভস্মাক্ষের যুদ্ধ ও মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রা, মায়াসীতা বধ, বিভীষণ কর্তৃক মেঘনাদের মরণোপায়, যজ্ঞভঙ্গ ও ইন্দ্রজিত বধ, সুষেণ কর্তৃক লক্ষ্মণের ক্ষত চিকিৎসা, রাবণ মন্দোদরীর বিলাপ, রাবণ কর্তৃক সীতাবধের উদ্যোগে মন্দোদরীর বাধাদান, রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ শক্তিশেল, রামের বিলাপ, হনুমানের গন্ধমাদন যাত্রা, গন্ধকালী উদ্ধার, কালনেমি বধ, সূর্যকে কক্ষতলে গ্রহণ, গন্ধর্ববিজয়, ভরতের বল পরীক্ষা, লংকায় আগমন, লক্ষ্মণের জীবন লাভ, হনুমানের কক্ষতলস্থ সূর্যদেবের মুক্তি, রাবণ কর্তৃক মহীরাবণকে স্মরণ, মহীরাবণের আশ্বাস দান, বিভীষণ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণকে প্রহরার ব্যবস্থা, মহীরাবণ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণ হরণ, হনুমানের পাতাল পুরে গমন - রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ, ব্রহ্মা কর্তৃক মহীরাবণের পূর্বজন্ম কথন, হনুমান কর্তৃক মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধ, রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন, রামের জন্য ইন্দ্রের রথ প্রেরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, রাবণ কর্তৃক অম্বিকা স্তব, দেবীর রাবণকে অভয় প্রদান, রাবণ বধের জন্য অকাল বোধন, দুর্গোৎসব নবমী পূজা, হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ণ, দেবী কর্তৃক একটি পদ্মহরণ, রামের দেবীস্তুতি, একটি চক্ষুদানের সংকল্প, দেবীর দয়া ও রামের বরলাভ, দশমীপূজান্তে বিসর্জন, হনুমানের চণ্ডীর শ্লোক বিলোপ করণ ও চণ্ডীপাঠে ভ্রমোৎপাদন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, রাবণ বধ, রাবণের নিকট রামের রাজনীতি শিক্ষা, বিভীষণের শোক, মন্দোদরীর বিলাপ ও রামের নিকট অবৈধব্য বরলাভ, রাবণের সৎকার ও মুক্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার রাম সম্ভাষণে যাত্রা, মন্দোদরীর অভিশাপ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার জন্য রামের বিলাপ, অগ্নি কর্তৃক সীতা সমর্পণ, দশরথের শ্রীরাম সম্ভাষণ ও ভরতকে বরদান, ইন্দ্র কর্তৃক মৃত বানরদের জীবন দান, সীতা রামের মিলন। বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের সন্তোষ বিধান, অযোধ্যা যাত্রা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সেতুভঙ্গ, শ্রীরামের শিবপূজা, ভরদ্বাজাশ্রমে

গমন, রামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ, রামের রাজ্যাভিষেক, অভিষেকে দেবকন্যাগণের আশীর্বচন, সীতা ও রাম কর্তৃক বানরগণের পুরস্কার, হনুমানের নিজের বক্ষমধ্যে রামনাম প্রদর্শন, হনুমানের ভোজন, বিভীষণাদির বিদায় ।

উত্তরা কান্ড : — রামের সভায় মুনিগণের আগমন, লক্ষ্মণের চতুর্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য-নিদ্রাজয়, উপবাস বৃত্তান্ত, রাক্ষসগণের জন্ম বৃত্তান্ত, মালী-সুমালী মাল্যবানের জন্ম, লংকাতে রাক্ষস রাজত্ব স্থাপন, গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত, মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবাকের পাতাল প্রবেশ, কুবেরের জন্ম তপস্যা ও লংকায় রাজত্ব, রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, রাবণ কর্তৃক লংকারাজ্য অধিকার, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম, কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ, রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ, রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা, বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার ও বেদবতীর অভিশাপ । মরুত্ত রাজার যজ্ঞ ও রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার, রাবণ কর্তৃক অনরণ্য বধ ও অনরণ্যের অভিশাপ । কার্তবীর্যার্জুনের কাছে রাবণের পরাজয় । পুলস্ত্যের মধ্যস্থতায় রাবণের মুক্তি ও কার্তবীর্যসহ রাবণের সখ্য, বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা, যমলোকে রাবণের অভিযান, রাবণের নিকট যমের পরাজয়, রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয় । রাবণের নিবাতক সহ যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের বরুণপুরী বিজয় । বলির যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা, মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের চন্দ্রলোক জয়, রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ, সূর্পনখার বৈধব্য, রাবণের স্বর্গজয়ে যাত্রা, মধুদৈত্যের সহিত মিলন, রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ, রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়, হনুমানের বিবরণ, রামসীতার জন্য বিশ্বকর্মার প্রমোদ ভবন নির্মাণ, ভদ্র নামক মন্ত্রীর কাছে রামের সীতা সম্বন্ধে অপবাদ শ্রবণ, সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের স্বর্ণ সীতা নির্মাণ, কালিঞ্জর রাজার বিবরণ, শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ দৈত্য বধ, রাম কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ, ব্রাহ্মণপুত্রের জীবনলাভ, গৃধিনী ও শেবকের কলহ, মৃত্যুহারী দৈত্যরাজের কথা, রামের অশ্বমেধ করার সংকল্প, শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়, লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন, লবকুশের সহিত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পতন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ ও পতন । রামচন্দ্রের যুদ্ধ আয়োজন, লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ, শ্রীরামের বিলাপ, রামের পরাজয়, সীতার নিকট

[redacted] লবকুশের যুদ্ধের বিবরণ, সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সংকল্প, বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্য রামচন্দ্রের প্রাণদান, লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লবকুশের বিলাপ, ব্রহ্মাদির উপদেশ, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও রামায়ণ গান, সীতাবিরহে রামের বিলাপ, ভরত কর্তৃক কেকয় দেশে তিনকোটি গন্ধর্ববধ, রামাদির অষ্টপুত্রের অভিষেক, কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জন, শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ।

## কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিশ্লেষণ

জীব মাত্রেই স্থান কালের অধীন । তবে অন্যান্য জীবের মতো মানুষের ক্ষেত্রে এই অধীনতা সর্বাতিশায়ী নয়, আংশিক । বিদ্যাবুদ্ধি বিচার বিবেক সম্পন্ন মানুষের একটি চক্ষু থাকে সমকালের উপর চঞ্চল, অপরটি নিত্যকালের দিকে স্থির । মানবচিত্তে একই সঙ্গে অন্ত ও অনন্তের লীলা । আবার যাঁরা কবিত্বশক্তি সম্পন্ন তাঁদের একটি তৃতীয় নয়ন থাকে নিত্য ও অনিত্যের । চিরকালের ও সমকালের মধ্যে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যসূত্র আছে তা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা সত্যকে নিজ রুচি ও শক্তিদ্বারা রসসিক্ত করে, কল্পনার রঙিন আলোকে উদ্ভাসিত করে, নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞারূপ প্রতিভা বলে রচনা করেন কাব্য — মহাকাব্য । মানুষের চিরকালের অবিনশ্বর সম্পদ । কিন্তু মানুষ মাত্রেই বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন । কাজেই নানা কবির কাব্যে নানা সুর, স্বকীয়তায় বৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্য । অনুবাদও একধরণের সৃষ্টি । কাজেই মূল কবির ভাবনা-চিন্তা, রচনার ভঙ্গি, বর্ণনার বস্তুর সঙ্গে অনুবাদকের সমকালের মানসিকতার সংমিশ্রণ ঘটে — ফলে মূলের সঙ্গে অনুবাদকের নিজের কথা — যুগধর্ম ও পরিবেশের কথা মিশে যায় । অনুবাদকের মনের গঠন অনুসারে একই বিষয়ের ভাষান্তরে ইতর-বিশেষ হয়ে পড়ে, বিষয়ানুগত্যের সঙ্গে নিজস্বতার একটা সন্ধি হয় ।

কবি কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । বাল্মীকির কথাবস্তুকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেও নিজের ভাব-ভাবনা দ্বারা বহুক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র করেছেন, নূতনতর করেছেন । এই সূত্রেই আসে পুরাতন বস্তু বর্জন, নতুন সংযোজন, পুরাতনের খানিকটা সংস্কার বা শোধন প্রমুখ পদ্ধতি । কেবল কাহিনী বা ঘটনা সংস্থানে নয়, চরিত্র সৃষ্টিতেও তার স্বাক্ষর স্পষ্ট ।

সপ্তকান্ড রামায়ণে – পাঁচটি কান্ডের নাম ঠিক থাকলেও বাল্মীকির বাল-কান্ড ও যুদ্ধকান্ড কৃত্তিবাসের ভাষায় আদি কান্ড ও লংকা কান্ডে নামান্তরিত হয়েছে। প্রথমটি আদি ও শেষটি উত্তর এই নামাংকন অপেক্ষা আদি ও উত্তর কি অধিক তাৎপর্য-বহ নয় ? আর যুদ্ধ তো অনেকই আছে, কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধ, লংকার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্ময়কর যুদ্ধ হয়েছে কয়টি ? কবি-ও বলেছেন – 'রাম-রাবণয়ো যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ।।' বাংলা প্রবাদ 'লংকা কান্ড' – কৃত্তিবাসের অবদান।

বাল্মীকির রামচন্দ্র মূলতঃ মানুষ, মহত্তম মানুষ, ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার – স্বয়ং ঈশ্বর মনে হয়। ভাবনা যেন উত্তরণধর্মী। কিন্তু কৃত্তিবাসের সমকালে ভক্তি-বন্যা অবাধ উত্তাল, ভাবনা অবতরণধর্মী। প্রথমেই বিষ্ণুর চার অংশে প্রকাশ। নারদের বিস্ময়, ব্রহ্মার জিজ্ঞাসা ও মহাদেবের বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ।

মহাপাপী হয়ে যদি রাম নাম লয়।
সংসার সমুদ্র তার বৎস পদ হয় ।। (৮)

তারপর মহাপাপী রত্নাকর দস্যুর মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি-তে রূপান্তর ও উত্তরণ রাম-নাম মন্ত্রে। এই কাহিনী কৃত্তিবাসের নতুন সংযোজন। নিজের জীবনসত্যটি, যে রাম-নাম নৃশংস দস্যুকে পরম কারুণিক ঋষিতে রূপান্তরিত করে সেটি – আদি কবির ভূমিকা – তারপর ক্রৌঞ্চবধ ও 'মা নিষাদ' শ্লোকের উক্তি এবং নারদের উপদেশে রামায়ণ শ্রবণ ও রচনা এটা – মনে হয় অধিকতর নাটকীয়।

রামচন্দ্র সূর্যবংশে আবির্ভূত হবেন তাই এ বংশের পূর্ব রাজাদের কথা বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস, বাল্মীকির ধারায় সগর বংশের কথা, ভগীরথ, গঙ্গাবতরণের কথাও বলেছেন। মোটামুটি ঠিক থাকলেও ঐরাবত প্রসঙ্গ, কান্ডার মুণির কথা কৃত্তিবাসের নতুন সংযোজন। সূর্যবংশের রঘুর বিক্রম-অজ-ইন্দুমতী-দশরথ জন্মাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কৃত্তিবাস কিন্তু বাল্মীকির সমুদ্রমন্থনাদি বাদ দিয়েছেন। বিশ্বামিত্রের জীবনকাহিনী-ও কৃত্তিবাস বর্ণনা করেন নি। বাল্মীকির রামায়ণে – রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যখন যাত্রা করেছেন বিশ্বামিত্র – তখন এইসব প্রসঙ্গ উঠেছিল চমৎকার ভাবে, কৃত্তিবাসে

নেই। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন ও যজ্ঞাদি বর্ণনার পর চরু ভাগ নিয়ে ঋষি কবির সঙ্গে বাঙালী কবির পার্থক্য আছে। মূলে আছে পায়সের ষোল ভাগের ৮ ভাগ কৌশল্যা, সুমিত্রা ৬ ভাগ আর কৈকেয়ী পেয়েছিলেন ২ ভাগ। কৃত্তিবাস লিখেছেন —

কৌশল্যা কৈকেয়ী তার মুখ্যা দুইরাণী।
এক ভাগ চরু হৈলা দুই খানি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগ দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥

চরু না পেয়ে সুমিত্রা কাঁদতে লাগলেন। তখন কৌশল্যা নিজের ভাগের অর্ধেক দিয়ে সুমিত্রাকে বললেন —

ইহাতে তোমার যদি জন্মায় নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন ॥

তন্বুরমতি কৈকেয়ী তখন তার পুত্রের সঙ্গী হবে এই শর্তে নিজের চরুর ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন। বাঙালী কবির হিসাব সহজ — রাম লক্ষ্মণ ও ভরত, শত্রুঘ্নের স্বাভাবিক পারস্পরিক প্রীতি কারণ সহজভাবে বলেছেন বা আবিষ্কার করেছেন।

কৃত্তিবাসের আর একটি নূতনত্ব - বিশ্বামিত্র দশরথের কাছে রাম লক্ষ্মণকে যজ্ঞ রক্ষার জন্য নিতে এলে তাদের বদলে ভরত শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের হাতে তুলে দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন রাজা। তার কারণও ছিল। দশরথের মনে ছিল অন্ধকের অভিশাপ — পাছে রামের অদর্শনে মৃত্যু হয়।

পুত্র শোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন ছলে ॥

তাই — প্রাণ চাহে যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
এক দণ্ড রামচন্দ্র না দেখিয়া মরি ॥

প্রতারণা ধরা পড়ল ভরতের কথায় । বনের পথে গিয়ে বিশ্বামিত্র দুটি পথ দেখিয়ে বললেন — এই পথে আশ্রমে যেতে লাগবে তিনদিন অপর পথে — তিন প্রহর । তবে সোজা পথে ভয় আছে তাড়কা রাক্ষসীর । ভরত উত্তর করলেন — "দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন ।" চমকে উঠলেন বিশ্বামিত্র । সে কি ? এই কি রাক্ষসের শাস্তা রাম ? প্রতারণা ধরা পড়ল — অযোধ্যা দগ্ধ করবেন ক্রুদ্ধ কৌশিক । তারপর রাম লক্ষ্মণ গেলেন । যজ্ঞরক্ষা, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ। রামাদি চার ভ্রাতার বিবাহ, পরশু রামের দর্পচূর্ণ ঘটনা পরম্পরা বাল্মীকির ধারাতেই বর্ণিত । কিন্তু বহুক্ষেত্রে কৃত্তিবাস নিজস্বতা দেখিয়েছেন — গভীর ভক্তি রসের সঙ্গে কৌতুক রসের মিশ্রণে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন কৃত্তিবাস । কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা যাক ।

রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাবণের অশুভ সূচিত হল ।

আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে ।
মাথার মুকুটখানি পড়ে ভূমিতলে ।।

কী ব্যাপার ? বিভীষণ বললেন — "তোমাকে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ।" রাবণ শুক সারণকে পাঠালেন সন্ধান নিতে । অযোধ্যায় গেল শুক সারণ ।

"পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুই জন ।
চতুর্ভুজ রূপে দেখিলেন নারায়ণ ।।"

তারা ঠিক করল এ খবর রাবণকে দেবে না । বলল কোথাও কিছু দেখে নি । তখন বিভীষণের পরামর্শে ফাড়া কাটাবার জন্য তীর্থ জলে স্নান করলেন রাবণ ।

২) রাম ও ভরতের নামকরণ —

যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপে অবিরাম ।
কৌশল্যা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ।।
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত ।
সেই হেতু তার নাম হইল ভরত ।।

৩) বশিষ্ঠের বাড়ীতে রাম পাঠ নিয়েছেন —

ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি ।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
***  ***  ***
কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর ।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥

অস্ত্র শিক্ষা । ধনুর্বাণ হাতে রাম ঘুরছেন এমন সময় মারীচ এল মৃগ হয়ে । রাম বাণ মারলেন —

ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে ।
মহাভীত্ মারিচ পালায় মহা ত্রাসে ॥

৪) রাম তো চৌদ্দ বৎসর বনে যাবেন রাবণ বধ করতে । কিন্তু ফলমূল খেয়ে যুদ্ধ করতে পারবেন কেন ? ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন —

মৃগান ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা ।
খাইয়ে অমৃত রস পাশরিবে ক্ষুধা ॥

৫) গঙ্গাস্নানে গেলেন দশরথ রামকে নিয়ে । নারদ বল্লেন দশরথ অজ্ঞান ।

পতিত পাবনী গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে ।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যার পদতলে ॥

তার আবার গঙ্গা স্নান পুণ্য ? নারদের কথা শুনে দশরথ ফিরে যাবেন কিন্তু রাম যেতে চাইলেন - গঙ্গার মহিমা ম্লান হবে । চণ্ডালরাজ গুহক রামকে দেখতে চাইল । দশরথ দেখাবেন না । যুদ্ধ শেষে সাক্ষাৎ হল । গুহক আত্মনিবেদন করে পূর্বজন্মের কথা শোনালেন, ছিলেন বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব । অন্ধক মুনির পুত্রকে হত্যা করায় দশরথের যে পাপ হয়েছিল তা দূর করতে বামদেব তিনবার রাম-নাম করতে বলেছিলেন দশরথকে । তিনবার কেন ? একবার-ই পর্যাপ্ত । কাজেই এই অপরাধের জন্য বশিষ্ঠ-শাপ দেন, ফলে এ জন্মে চণ্ডাল । রাম গুহকের সঙ্গে মিত্রতা করেন ।

৬) অহল্যা উদ্ধারের পর গঙ্গা পার হয়ে মিথিলা যাবেন বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ সহ । নাবিককে ডাকলেন । নাবিক শুনেছে পায়ের ধুলিতে পাষাণ মানুষের মূর্তি হয় । কাজেই রামকে নিতে পারবে না –

নৌকা মূর্ত হয় যদি লাগি পদধূলি ।
কি দিয়া পূষিব আমি মম পোষ্যগুলি ।।

৭) হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করতে এসেছেন রাবণ । বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন । শেষবার চেষ্টা করছেন –

আর বার রাবণ ধনুক খান টানে ।
তুলিতে না পারে চায় গৃহস্তের পানে ।।
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরিখে ।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ।।

৮) রামকে দেখে সীতা তাঁকে পতিরূপে পাবার জন্য ব্যাকুলা হলেন । সুকুমার তনু রাম কি হরধনু ভাঙতে পারবেন ? সীতা রাম পতি প্রাপ্তির প্রার্থনা জানালেন । দৈববাণী হল —

শুন গো জনক সুতা না হইও দুঃখ যুতা
স্বামী তব রাম গুণমণি ।।

৯) বাঙালী বিবাহের প্রতিরূপ রামসীতার বিবাহ, নান্দীমুখ, বরপক্ষ ও কন্যা-পক্ষের পরিচয় –

হরিদ্রা মাখায় চারি বয়ে কুতূহলে ।
অঙ্গেতে পিঠানী দিল সখীরা সকলে ।।
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বয়ে ।
বান্ধিল মঙ্গল সূত্র তাহাদের করে ।।

তারপর বিবাহান্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভোজন শেষে দধি, দুগ্ধ এবং কর্পূর তাম্বুল করে মুখের শোধন ।

১০) পরশুরামের দর্পচূর্ণ বৃত্তান্ত একটি কৌতুককর টিপ্পনী দিয়েছেন কৃত্তিবাস। পরশুরাম যখন রামকে বললেন আমার ধনুকে গুণ দাও — তখন সীতার মনে দুর্ভাবনা এল —

একবার ধনুক ভাঙিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুণি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥

অযোধ্যা কাণ্ডের মূল বিষয় কৈকেয়ীর চক্রান্ত রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনে গমন, দশরথের মৃত্যু, রামকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা ভরতের, রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং চিত্রকূট হয়ে রাম-সীতার বনান্তরে পর্যটন। কৃত্তিবাস এই মূল কাহিনী-ই অনুসরণ করেছেন কিন্তু সর্বত্র-ই কম বেশি নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে।

রামকে রাজা করার অনুরোধ দশরথের কাছে প্রথম করেন রাজন্যবর্গ — দশরথ নয়। বাল্মীকির অনুরূপ কৃত্তিবাসের দশরথও বলেছিলেন —

আজি অধিবাস পুনর্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ড ছত্র॥

কৃত্তিবাস মন্থরার পরিচয় ও কর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

পূর্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুব্জী হয়ে নামেতে মন্থরা॥
***  ***  ***
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥

কৈকেয়ীর বর, রাম-দশরথ, রাম কৌশল্যা, রাম-সীতা, রাম-লক্ষ্মণ — বৃত্তান্তে কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকির রামের মত কৃত্তিবাসের রাম-ও কৈকেয়ীর দোষ দেখেন নি — বলেছেন দৈবই স্নেহময়ী কৈকেয়ীর দুর্মতির হেতু —

বিধাতার দোষ নাহি দোষী নহে কৈকেয়ী ।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজি ।।

বন গমনকালে কৌশল্যার সীতার প্রতি উপদেশ ও লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার প্রসিদ্ধ উক্তি-টি – কৃত্তিবাস একটু ঘুরিয়ে ভাষান্তর করেছেন —

রামং দশরথং বিদ্ধি মাংবিদ্ধিজনকাত্মজাম্ ।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব শাস্ত্রে জানি ।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী ।।

কৃত্তিবাসের রচনায় রামের বনগমন বর্ণনা, বাল্মীকির মত শোকাবহ গম্ভীর নয় – অনেকটা সাদামাটা । গৃহক প্রসঙ্গ সংকীর্ণ । সুমন্ত্রের বিদায় গ্রহণের পর কৃত্তিবাস জয়ন্ত কাকের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন । এটি বাল্মীকি করেছিলেন লংকাকাণ্ডে সীতার মুখে একটি গোপন অভিজ্ঞান রূপে হনুমানের কাছে রামের জন্য । অবশ্য কৃত্তিবাস-ও সেইখানে এই নিদর্শনের কথা বলেছেন ।

মাতুলগৃহে ভরত যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন তা সংক্ষেপে বলেছেন কৃত্তিবাস একটু তরল ভাবে –

স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-সীতা গিয়াছেন বন ।।

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সসৈন্য ভরতের আপ্যায়ন বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ –

চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ।।

পাদুকা সহ ভরতের প্রত্যাবর্তন কাহিনী-ও সরল, বাল্মীকির রচনার মতো বিচারবহুল - আবেগগম্ভীর নয় । নন্দীগ্রামে অবস্থান দিয়েই বাল্মীকি শেষ করেছেন । কিন্তু দশরথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও গয়া কৃত্যের কথা বলেছেন কৃত্তিবাস নিজস্ব ধারায় ।

রামের পিণ্ড দিতে বিলম্ব হওয়ায় দশরথ আবির্ভূত হয়ে সীতার কাছে পিণ্ড প্রার্থনা করেন । সীতা তুলসী, ব্রাহ্মণ, ফল্গু নদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষ্য রেখে বালুর পিণ্ড দান করেন এবং দশরথ তৃপ্ত হয়ে চলে যান । তারপর রাম এলে সীতা এই বিবরণ দেন । সীতা বিষয়টির সত্যতার সম্বন্ধে সাক্ষীদের ডাকেন । ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গু মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু সত্য বলে বটবৃক্ষ । সীতা তিনজনকে অভিশাপ ও বটবৃক্ষকে বর দেন – ব্রাহ্মণকে বলেন –

লক্ষ টংকার দ্রব্য-ও থাকে যদি ঘরে ।
ভিক্ষার লাগিয়া যাবে দেশ দেশান্তরে ॥

তুলসীকে বলেন –

অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে ।
শৃগাল কুকুরে তোরে অশুচি করিবে ॥

ফল্গুর প্রতি অভিশাপ –

অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্বকাল ।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুর শৃগাল ॥

বটবৃক্ষকে বর দেন রাম ও সীতা । রাম বলেন বটকে চিরজীবী অক্ষয় অমর হবে সীতা বলেন –

ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার ।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥

তারপর গয়া মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অযোধ্যা কাণ্ড শেষ ।

অরণ্য কাণ্ডের মুখ্য বিষয় সীতাহরণ ও সীতা অন্বেষণ । প্রথমে অত্রি আশ্রমে । দেবী অনসূয়া সীতাকে দিব্য বস্ত্রাভরণ দিলেন । তারপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ ও আনন্দ । বিরাধ বা শরভঙ্গ মুনির আশ্রম হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ ।

এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন ॥

তখন সুতীক্ষ্ণ মুনির নির্দেশে অগস্ত্যাশ্রমে গেলেন তারা । ইল্বল-বাতাপির কাহিনী শুনলেন । তারপর পঞ্চবটীতে কুটির বাঁধলেন । এখানে এল শূর্পনখা । খড়্গাঘাতে নয় –

শ্রেধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কাণ ।।

রাক্ষস নিধন, খর দূষণ বধ । শূর্পনখা ছুটে গেল রাবণের কাছে । বিবরণ জানিয়ে বলল –

সীতার রূপের সম নাই আর নারী ।
উর্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি ।।

সীতা হরণের বুদ্ধি দেয় শূর্পনখাই –

তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ।

তাকে হরণ কর ।

তারপর রাবণ মারীচ সংবাদ । যথা নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ । কেবল সীতার ভর্ৎসনায় লক্ষ্মণ একটি রক্ষাগণ্ডী কেটে রক্ষার শেষ চেষ্টার নতুন কথা –

গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর ।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ।।

তারপর সীতাহরণ । জটায়ুর বৃদ্ধি বিশদ বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস । ঋষ্যমূক পর্বতে বানরদের কাছে অলংকার নিক্ষেপের কথা আছে । নতুন কথা সম্পাতি নন্দনসুপার্শ্বের প্রসঙ্গ । সুপার্শ্বই রাবণকে বাধা দিল রাবণ নিবেদন করল যে রাম তার বোনের অপমান করেছে তাই রামের স্ত্রী হরণ করছে সে –

করিয়াছে রাঘব আমার অপমান ।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান ।।
তাই খর দূষণের রাম মহা অরি ।
সেই শ্রেধে হরিনাম রামের সুন্দরী ।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জয় ।
তব ঠাই পক্ষিরাজ মানি পরাজয় ।।

কৃত্তিবাসের সীতা সমুদ্র দেখে প্রথম মূর্চ্ছিতা পরে সমুদ্র লংঘন করে কীভাবে রাম আসবেন ভেবে উদ্বিগ্না হলেন । রাবণ-ও উদ্বিগ্ন কোথায় লুকিয়ে রাখবেন সীতাকে । বাল্মীকির রাবণ আটজন রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিলেন দন্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি নজর রাখতে । কৃত্তিবাসের রাবণ চৌদ্দ জনকে নির্দেশ দিলেন । কিন্তু রামের ভয়ে তারা পালিয়ে গেল লংকা ছেড়ে ।

আর একটি নতুন কথা — ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন - সীতাকে দশমাস বাঁচিয়ে রাখার জন্য অমৃত পরমান্ন দিতে । ইন্দ্র গেলেন — নিজের পরিচয় দিলেন সীতাকে ।

মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল ।
প্রতিদিন আমি তোমাকে যোগাইব সুধাফল ।।

এদিকে দন্ডকারণ্যে রামের বিলাপ । জটায়ুর কাছে সীতাহরণের সংবাদ, কবন্ধ বধ, শবরী উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা ।

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের মুখ্য বিষয় সুগ্রীব - রামের মিত্রতা - বালিবধ ও সীতার অন্বেষণ । ঘটনার বিষয় ও পরম্পরা মূলানুসারী । কৃত্তিবাস রাম মাহাত্ম্য আলাদা বর্ণনা করেছেন । অতি পরিচিত মহিমা-স্তুতিটি এখানে আছে —

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই অংশটি শ্রীরামপুরী সংস্করণে ছিল না, বটতলা সংস্করণে যুক্ত হয়েছে । কাজেই হয়ত জয়গোপাল তর্কালংকারের সংশোধন । বালী - সুগ্রীবের বিরোধ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃত্তিবাসের সুগ্রীব — "রাজমহাদেবী" তারাকে-ও রাজ-সিংহাসনের সাথে গ্রহণ করেছিলেন সে কথা বলেছেন । বালীর পরাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন এবং রামের পক্ষে বালীবধ সম্ভব হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করেছেন । ফলে রামকে শক্তির পরীক্ষার জন্য দুন্দুভির পঞ্জর-পদাঘাতে —

ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন ।
ফেলেন যোজন শত কমল লোচন ।।

এবং সপ্ততাল ভেদ করতে হয়েছিল ।

সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার ।

* * * * *

এবং পুনর্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ।

দ্বিতীয়বার সুগ্রীবের ডাকে যুদ্ধে যেতে তারা বালিকে বারণ করেছিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রীর কথা বলেছিলেন । কিন্তু সত্যবাদী রাম বালিকে মারবেন একথা বিশ্বাস করেননি বালি । বাণাহত হয়ে রামকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন বালি । রামের মুখ্য উত্তর ছিল —

ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন ।

তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন ॥

ভক্তাধীন ভগবানের ভূমিকা । তারপর বাল্মীকির কাহিনী অনুবর্তন কেবল বিশেষ রামের প্রতি তারার অভিশাপ —

আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে ।

কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে ॥

আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন ।

সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥

পম্পা দর্শনে বর্ষা ও শরতে রামের বিরহ বাল্মীকির বর্ণনায় যে অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়েছে তিনটি (২৮-৩০) সর্গে, বিভিন্ন গম্ভীর ছন্দের ১৮৫টি শ্লোকে কৃত্তিবাস রচিত কিঞ্চিদধিক ৫০টি পয়ারে তার প্রত্যাশা ও তুলনা করা বাতুলতা । তবু এই কথাগুলি গভীর আন্তরিকতায় ব্যাকুলতায় মধুময় ।

একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস ।

কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥

আমা বিনা জানকীর আনা নাহি মন ।

এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ।

কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত ।

কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিত ॥

পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার ।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ।।

তারপর লক্ষ্মণের ভর্ৎসনায় সচকিত সুগ্রীবের দিকে দিকে সীতা অন্বেষণের জন্য বানর-সৈন্য প্রেরণের বৃত্তান্ত মোটামুটি মূলানুগ –

কৃত্তিবাস এখানে বর্ণনা স্থগিত করে
রামনাম বল ভাই মুখে বার বার ।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ।। ইত্যাদি

এবং এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
হেলায় তরিয়ে যাব মুখে বল হরি ।। ইত্যাদি ৫৩টি পয়ার দিয়েছেন । ভক্তিবিহ্বলতা তো বটেই কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বুঝা যায় যে এটি উদ্দেশ্যমূলক । এর পরই হনুমানাদির সীতা সন্ধানে গমন ও পরে রামনামে সমুদ্র লংঘন । কাজেই এই ভক্তি ও নাম মহিমার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ । যাহোক স্বয়ং প্রভার গহ্বরকে কৃত্তিবাস দক্ষিণ পাতাল বলেছেন – এবং স্বয়ং প্রভার নামের বদলে বলেছেন সম্ভবা । অন্যান্য কাহিনী মোটামুটি ঠিক ।

তারপর বানরগণের সমুদ্রতীরে আগমন এবং সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ – এবং সীতাকে রাবণ হরণ করে লংকায় নিয়ে গেছেন সংবাদপ্রাপ্তির বিবরণ । রাম নাম ও কথা শ্রবণে সম্পাতির দগ্ধ পক্ষের পুনরুদ্গম হল, সম্পাতি উড়ে গেলেন । বাল্মীকির অনুগত হয়ে কৃত্তিবাস-ও –

সম্পাতি বলিল আমি রাম কার্য করি ।
রামায়ণ প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি ।।
হইল উত্তম পক্ষ দেখিতে সুন্দর ।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর ।।

বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের শেষে সাগর লংঘনের পরামর্শ বৈঠকের উল্লেখ করেছেন কিন্তু কৃত্তিবাস তা করেছেন সুন্দরা কাণ্ডের সূচনে । তবে এখানে কৃত্তিবাস —

পঞ্চ-সৃষ্টী রামায়ণের উল্লেখ করেছেন –

আদ্য কাণ্ডে রাম জন্ম বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্য ভার ।।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয় ।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটক সঞ্চয় ।।
সুন্দরা কাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার ।
লংকাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ।।
কথা সাত কাণ্ডের উত্তরাকাণ্ডে পড়ে ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিঙরে ।।
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান ।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ।।

সুন্দর কাণ্ডের মূলকথা 'হনুমানের লংকা গমন এবং লংকা দহন ও সীতার বার্তা নিয়ে রামের কাছে প্রত্যাবর্তন ।' বাল্মীকি ৬৮টি সর্গে সুন্দরকাণ্ড রচনা করেছেন । কৃত্তিবাসের সুন্দরাকাণ্ডের বিষয় বাল্মীকি অপেক্ষা খানিকটা বিস্তৃত । তার মধ্যে বাল্মীকির কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের শেষের খানিকটা - বানরদের সমুদ্র লংঘনের উদ্যম এবং লংকা কাণ্ডের প্রথমের খানিকটা সমুদ্র সেতুবন্ধন, বিভীষণের রামের শিবিরে যোগদানাদি – বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে । কাণ্ডানুসারী বিষয় বিভাগে খানিকটা ভিন্ন হলেও বিষয়ের দিক থেকে ধারাবাহিকতা খণ্ডিত হয় নি ।

কে সাগর লংঘন করে লংকায় গিয়ে সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম এ নিয়ে বানরদের মধ্যে আলোচনা । জাম্বুমান হনুমানের জন্মকথা ও দক্ষতার কথা বলেন । বিবরণে একটু পার্থক্য আছে । মূল রামায়ণের মতে পুঞ্জিকস্থল্য নামে এক অপ্সরা অভিশপ্তা হয়ে কুঞ্জর বানরের কন্যা অঞ্জনা রূপে জন্মগ্রহণ করেন । তার বিবাহ হয় কেশরী বানরের সঙ্গে । বায়ুদেবতার সংযোগে তার এক পুত্র হয় – হনুমান । কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা –

কুঞ্জর তনয় নামে ছিল বিদ্যাধরী ।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ।।
সেই বানরীর এক হইল কুমারী ।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ।।
মলয় পর্বতে বায়ুদেব অধিষ্ঠান ।
কৃপা করি অঞ্জনারে দিল বরদান ।।
মহাবীর হবে এক উদরে তোমার ।।

আর একটি খবর দিয়েছেন কৃত্তিবাস - হনুমানের জবানী । একবার তার পিতা কেশরী হস্তীর আক্রমণ থেকে ভরদ্বাজ ঋষিকে রক্ষা করেন । মুনি বর দিতে চাইলে —

কেশরী বলেন যদি বর দিতে হয় ।
তবে যেন পাই এক উত্তম তনয় ।।
মুনিরাজ বলে তুমি চাহিলা যে বর ।
ত্রৈলোক্য বিজয়ী হবে তোমার কোঙর ।।
পাইয়া মুনি রাজে করি নমস্কার ।
মলয় পর্বতে গেল যথা পরিবার ।।
পবনের বরে মাতা করে জন্মদান ।
সেই সে কারণে আমি পবন নন্দন ।।

লংকাযাত্রার পূর্বে হনুমান পূর্বমুখ হয়ে বসে "গণেশাদি পঞ্চ দিকপালের পূজা করে, পিতার আশীর্বাদ নিয়ে রামের স্তব করলেন —

তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয় ।
তবে পিপীলিকা যের তুলিতে পারয় ।।
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন ।
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লংঘন ।।

লম্ফ দিলেন হনুমান । সুরসার কাহিনী, মৈনাক পর্বত সম্ভাষণ এবং সিংহিকা বধের বিবরণ আছে । লংকায় চামুণ্ডার সাক্ষাৎ হল । তারপর লংকা দর্শন ও সীতা অনুসন্ধান ।

শেষে অশোক বনে সীতা দর্শন । পাঁচটি পয়ারের শিকনি দিয়েছেন হনুমানের মুখে কৃত্তিবাস । ঠিক রূপের বর্ণনা নয় শক্তি ও ঐশ্বর্যের অনুভূতি –

ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত ।
ইহা লাগি শূর্পনখার নাক কান হত ॥
ইহা লাগি চতুর্দশ সহস্র রক্ষ মরে ।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে ॥ ইত্যাদি

তারপর হনুমান শুনলেন রাবণ-সীতার বাক্যালাপ । মূল রামায়ণে আছে সীতার কর্কশ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বধ করতে চাইলে ধান্যমালিনী নামে এক পত্নী জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যান রাবণকে । কিন্তু কৃত্তিবাস এখানে মন্দোদরীকে এনেছেন।রাবণের কামনার উত্তরে সীতা বলেন –

শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর ।
রাম সিংহ তোরে দেখি যেমন কুক্কুর ॥

রাবণ খাঁড়া তুললেন সীতাকে বধ করতে, মন্দোদরী খড়্গ কেড়ে নিলেন ।

রাবণ সীতারে দেখি উন্মত্ত যেমন ।
খান্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন ॥

মন্দোদরী স্মরণ করালেন –

নল কুবেরের শাপ পাশরিলে মনে ।
নারীরে ধরিলে বলে মরিবে পরাণে ॥

এই শাপের কথা বাল্মীকিতে আছে এবং এসম্বন্ধে বাল্মীকির রাবণ খুব সচেতন । মন্ত্রীদের উৎসাহ উত্তেজনাতে-ও সীতাকে ধর্ষণ করতে সাহস করেন নি । কৃত্তিবাস একটি নূতন মাত্রা দিয়েছেন ।

ত্রিজটার দুঃস্বপ্নের কাহিনী শুনে চেড়ীরা নিরস্ত হয়ে প্রস্থান করলে হনুমানের সঙ্গে সীতার সাক্ষাৎ হল । রামের অঙ্গুরী দান এবং সীতার শিরোমণি গ্রহণ করলেন হনুমান । জয়ন্ত কাকের চক্ষু বিদ্ধ করার অভিজ্ঞান কাহিনীও শোনালেন সীতা । তারপর আম্রবন ভঞ্জন, রক্ষী রাক্ষস ও অক্ষকুমার বধ, ইন্দ্রজিতের হাতে হনুমানের

বন্দী হওয়া, রাবণের কাছে পরিচয় প্রদান, রাবণের ভ্রাতৃবধূ, দূত অবধ্য এই যুক্তিতে লেজে আগুন দেওয়া ইত্যাদি কাহিনী মূলানুগ - তবে কিছু নতুন রং চাপান আছে। হনুমানের লেজে আগুন দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকির সীতার মতো কৃত্তিবাসের সীতা-ও অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেছেন —

কায় মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাই হনু পাবে অব্যাহতি॥

লংকা দাহ করে হনুমানের উদ্বেগ হল — সীতা-ও এ আগুনে পুড়ে গেলেন না তো? বাল্মীকির রামায়ণে আছে যে অধিবাসীদের বিলাপ ও কথা থেকে হনুমান জেনেছিলেন অশোকবন দগ্ধ হয় নি। আর কৃত্তিবাসে —

দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে॥

এই বৃত্তান্তে কৃত্তিবাস আর একটি কৌতুককর লোকপ্রবাদের হেতু যুক্ত করেছেন। বাল্মীকির হনুমান সাগরের জলে নেজের আগুন নিভিয়েছিলেন — কিন্তু কৃত্তিবাসের হনুমান তা পারলেন না। সীতা বললেন 'মুখামৃত' দিতে। হনুমান জলন্ত লেজ মুখের মধ্যে দিলে মুখ-ই পুড়ে গেল। হনুমান বিমর্ষ হলেন। এ পোড়া-মুখ জাতিবর্গের কাছে দেখাবেন কী করে হনুমান?

সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া॥

তারপর হনুমানের প্রত্যাবর্তন। বানরগণের আনন্দ, কিষ্কিন্ধ্যায় মধুবন ভঙ্গ, রামের কাছে সীতার বার্তা ও শিরোমণি প্রদান। এবং বানর বাহিনী নিয়ে রামের সমুদ্রতীরে গমন মূলানুগ বিবরণ। এইখানে-ই মূল রামায়ণের সুন্দর কান্ড শেষ। কিন্তু কৃত্তিবাস আরো খানিকটা বলেছেন। লংকায় বিভীষণ রাবণকে পরামর্শ দিলে - রাবণ তাকে পদাঘাত করেন। বিভীষণ চারজন অনুচর সহ রামের শরণাগত হলেন। রামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ব্যাপারে বিভীষণ কৌতুক, তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি দিব্বি বা শপথ করেছিলেন —

ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে যায় মন ।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ।।
হইব কলির রাজা সহস্র তনয় ।
এই তিন দিব্য প্রভু করিনু নিশ্চয় ।।

কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা আর সহস্র সন্তানের পিতা হবার দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা উল্লেখ । সমুদ্রে সেতুবন্ধন সমুদ্রে বৃত্তান্ত মূলানুগ । সুন্দরাকান্ড শেষ করেছেন কৃত্তিবাস দুটি মৌলিক বৃত্তান্ত দিয়ে । একটি রামচন্দ্রের শিবপূজো অপরটি ভস্মলোচন বধ । রামের আরাধনায় শিব এলেন কৈলাশ থেকে ।

মহেশ বলেন প্রভু পূজো কর কার ।
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ।।
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও ।
রাবণ বধিতে তুমি পুণ্য জন লও ।।
শিব বলেন আমার সেবক দশানন ।
সীতা চুরি কৈল তার হউক মরণ ।।

ভস্মলোচন কাহিনী এইরকম । রাম সসৈন্যে লংকায় প্রবেশ করেছেন । রাবণ ভস্মলোচনকে পাঠালেন । চোখে ঠুলি বাঁধা ভস্মলোচন যার দিকে তাকাবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে । বিভীষণ রামকে বললেন – সকলের মুখে দর্পণ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে । রাম ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে কোটি কোটি দর্পণ সৃষ্টি করলেন সকলের মুখে । ভস্মলোচন চোখের ঠুলি খুলে তাকান –

আপনার মুখ দেখি দর্পণ ভিতর ।
ভস্ম হয়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ।।

লংকাকান্ড – বাল্মীকির পরিভাষায় যুদ্ধকান্ড সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ১২৮টি সর্গে এটি রচনা করেছেন আদিকবি । যুদ্ধকান্ড তথা কৃত্তিবাসের লংকাকান্ড-ও আয়তনে অন্যান্য কান্ড থেকে আরো বড় ।

কৃত্তিবাসের লংকাকান্ড সুরু রাবণের চর শুক সারণের রাম শিবিরে প্রবেশ, বন্দী হওয়া, রাম কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন ও মুক্তি বৃত্তান্ত দিয়ে । রাবণ শুক সারণের

সাহায্যে রামসৈন্যদের দেখেন এবং রাম কর্তৃক শর সন্ধানে নিরীক্ষণ করেন। শুক সারণের রামের প্রশংসা করায় রাবণের ভর্ৎসনা এবং শার্দূল গুপ্তচরকে প্রেরণ। সেও ধরা পড়ে মুক্তি পেল এবং শুক সারণের মত হিত উপদেশ দিল। এসব-ই মূলানুগত। তারপর বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়ে রামের কাটা মুণ্ড ও ধনুক বানিয়ে নিয়ে গেল সীতাকে দেখাতে অশোক বনে। সীতা রোদন করতে থাকেন। এমন সময় –

রাম জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী॥
মুণ্ড লইয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী।

মূলে কাহিনীটি একটু অন্যভাবে বর্ণিত। সরমা এল। সান্ত্বনা দিল সীতাকে। রাবণের মন্ত্রণা শুনতে ইচ্ছা হল সীতার।

সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দিক দেখি॥

বাল্মীকির সরমা বলেছিল যে সে প্রচ্ছন্নভাবে আকাশ মার্গে সব খবর আনতে পারে। যাহোক সরমা খানিক পড়ে এসে খবর দিল যে রাবণের মাতা ও মাতামহ মাল্যবান রাবণকে সীতা ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে সন্ধি করবার উপদেশ দিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন। রাবণ সৈন্য সজ্জা করছেন। মহোদর দক্ষিণে, ইন্দ্রজিত পশ্চিমে, পূর্ব দ্বারে প্রহস্ত, উত্তর দ্বারে স্বয়ং রাবণ। মূল রামায়ণের অনুরূপ। অন্য দিকে রামের নির্দেশে সুগ্রীব সৈন্যসজ্জা করলেন – পূর্ব দ্বারে নীল, অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে, হনুমান পশ্চিম দ্বারে – সেখানে রামলক্ষ্মণও থাকবেন আর উত্তরে সুগ্রীব। মূল রামায়ণের সঙ্গে পার্থক্য সামান্য। সেখানে রাম নিজেই নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং উত্তর দ্বারে থাকেন।

এখানে কৃত্তিবাস একটি মৌলিক কৌতুক দৃশ্যের সংযোজন করেছেন। রাম রাবণের যুদ্ধ দেখতে দেবতারা আকাশে সমবেত। দেবী পার্বতী মহাদেবকে তিরস্কার করে বললেন যে রাবণ তাঁর ভক্ত অথচ রাবণকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করছেন না শিব। আর কি জগতে কেউ শিবকে ভক্তি করবে? শিব বললেন রাবণের রক্ষার নেই, বিধির নির্বন্ধ।

বামা জাতি তোমার তিলেক নাই শঙ্কা ।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা ।।

বাল্মীকি প্রথম দিনের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন । রাবণকে দেখে তীব্র উত্তেজনায় সুগ্রীব তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন । দুজনে যুদ্ধ হল । রাবণের মাথার মুকুট কেড়ে নিলেন সুগ্রীব — তারপর লাফ দিয়ে চলে এলেন । রাম সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেন সুগ্রীবকে এই হঠকারিতার জন্য । উভয় পক্ষের প্রথম যুদ্ধ হল । পরে রামচন্দ্র যুদ্ধরীতি অনুসারে অঙ্গদকে দূত করে পাঠালেন রাবণের সভায় । আকাশ পথে গিয়ে অঙ্গদ রাবণকে চরম হুঁশিয়ারী দিলেন — সসম্মানে সীতা প্রত্যর্পণ না করলে তার মৃত্যু হবে, বিভীষণকে করা হবে লঙ্কার রাজা । রাবণ দূতকে বন্দী করার আদেশ দিলে — সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে অঙ্গদ রাবণের প্রাসাদচূড়া ভেঙ্গে নিজের নাম ঘোষণা করে ফিরে এলেন । বাল্মীকি একটি সর্গে সংক্ষেপে এই বর্ণনা করেছেন । তিনি যুদ্ধ ও সুগ্রীব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি । কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা এইরূপ —

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ ।।

কাজেই অঙ্গদকে পাঠানো হল রাবণের কাছে । অঙ্গদ রায় বার কৌতুক রসের একটি বিশেষ নিদর্শন কৃত্তিবাসী রামায়ণে । কবিয়ালের সওয়ালের মতো অনেক সরস বাক্যালাপ আছে — বিচিত্র ঘটনাও আছে । সবটাই কৃত্তিবাসের নিজস্ব রস সৃষ্টির প্রয়াস ।

অঙ্গদকে দেখি রাবণ ছলে মায়া পাতে ।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে ।।
সবাই রাবণ ভেদ - নাই এক জনে ।
অঙ্গদ করেন কথা কোন রাবণ সনে ।।

কেবল ইন্দ্রজিত ছিলেন নিজের স্বরূপে কাজেই তাকে সম্বোধন করেই *রায়বার* সুরু হল —

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা ।
এই যত বসি আছে সবি কি তোর পিতা ।।

ইত্যাদি সরস উক্তি প্রত্যুক্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে । শেষে রাবণের মুকুট কেড়ে নিয়ে অঙ্গদের প্রত্যাবর্তন ।

তারপর ইন্দ্রজিতের প্রথম যুদ্ধ – রাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন – সীতাকে তা দেখানো, সীতার বিলাপ, ত্রিজটার সান্ত্বনা – গরুড় আগমনে নাগপাশ মুক্তি কাহিনী মূলানুগ। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত গরুড় যে রামচন্দ্র তার ইষ্টরূপ - শ্রীকৃষ্ণ রূপ – দেখিয়েছিলেন এটি কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

রাম প্রথমটা রাজী হলেন না এ অবতার ধনুর্বাণধারী, বংশীধারী হওয়া সম্ভব নয় – 'সে রূপ দেখিলে কি বলিবে কপি গণে।' গরুড় বলল – কেউ দেখবে না পাখার আড়াল করে রাখবে সে।

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতা নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিল রূপ ধরে॥

হনুমান লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। শোধ তুলবার সংকল্প নিলেন রামভক্ত মহাবীর।

বাঁশী ঘসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥

যা হোক তারপর যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু হল ধূম্রাক্ষ, অকম্পনের বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্তেরও মৃত্যু হল। তারপর রাবণ এলেন যুদ্ধে। প্রথম দিনের যুদ্ধ। লক্ষ্মণকে ব্রহ্মা দত্ত শেল নিক্ষেপ করে মূর্চ্ছিত করেন রাবণ ও তাঁর অচেতন দেহ তুলে নিতে চেষ্টা করেন। তখন হনুমান —

রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড়॥

লক্ষণীয় যে অস্ত্রযুদ্ধ থেকে কৃত্তিবাসে বাক্‌যুদ্ধ অধিকতর শাণিত ও কৌতুকাবহ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধ ও মৃত্যু কাহিনী মূলানুগ ভাবেই কৃত্তিবাসে বর্ণিত – তবে রাবণ-কুম্ভকর্ণের সলাপ-টি কৃত্তিবাসের হাতে নতুন রূপ পেয়েছে। এই অদ্ভুতকর্মা রামের আসল পরিচয় কী – তা নিয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণের আলাপটি মজার নমুনা —

কুম্ভকর্ণ বলে হেন নয় মম মন ।
মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ ।।
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ।। –

এই ধরণের শিকলি পয়ার আছে দশ-বারটি ।

কুম্ভকর্ণের পতনের পর ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, মহীপাল, মহোদরের যুদ্ধ ও মৃত্যু মূলানুগ বর্ণনা । কৃত্তিবাস যুদ্ধ গমনোদ্যত চার রাবণ-নন্দনের জননীদের স্নেহপ্রবণ - বাঙালী মায়ের আদর্শে যে চিত্র এঁকেছেন – তা উল্লেখযোগ্য । পুত্রদের প্রাণ রক্ষার পরামর্শ দিলেন রাবণের চার পত্নী ।

চারি ভাই চতুর্দোলে লহ স্কন্ধে করি ।
শ্রীরামের দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী ।।
হেন কর্ম করিবে যদ্যপি রাজা রোষে ।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্বত কৈলাসে ।।
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর ।
সেবি তাঁকে পুত্র সব থাক তার ঘর ।।

শোকার্ত রাবণকে আশ্বস্ত করে দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করলেন ইন্দ্রজিত । কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল মায়ের কথা –

মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধ যাত্রা করি ।
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ।।

আর একটি বাঙালী মা ও বাঙালী অ-ত:পুরিকাদের নিখুঁত ছবি অংকন করেছেন কৃত্তিবাস । পুত্রের কল্যাণে হরপার্বতীর পূজা করছেন মন্দোদরী ।

কিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী ।
দশহাজার সতিনী সহ মন্দোদরী ।।
ন হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী ।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী ।।

মন্দোদরী লক্ষ লক্ষ চুম্বন দিলেন পুত্রকে জড়িয়ে ধরে । তিনি-ও বললেন —

সীতাকে রামেরে দেহ করহ পিরীতি ।
মজিল কনক লঙ্কা নাহি অব্যাহতি ॥

আরও বললেন —

তোমাকে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে ।
নর বানরের যুদ্ধে না যাইব দিতে ॥

ইন্দ্রজিত অবশ্য পিতাকে সমর্থন করলেন ।

তখন দুই লক্ষ রাক্ষী - যাদের স্বামী যুদ্ধে মরেছে নালিশ জানালো — গাল দিল শূর্পনখাকে । নিত্য দ্বিপ্রহরে হবিষ্য, নিত্য হাঁড়ি ফেলার বেদনা জানাল ।

যাহোক যথাবিধি যজ্ঞ করে যুদ্ধে গেলেন ইন্দ্রজিত । রাম লক্ষ্মণ মূর্ছিত হলেন । হনুমান ঋষ্যমূক পর্বত থেকে ওষুধ এনে তাঁদের চেতনা সম্পাদন করালো । তখন নবশক্তিতে বলীয়ান বানরসৈন্য লঙ্কা আক্রমণ করল ও দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন হল । এবার যুদ্ধে গেল'কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন ।' তারা দুজন ও পরে মকরাক্ষ যুদ্ধে হত হল । এদের কথা মূল রামায়ণে আছে । কিন্তু কৃত্তিবাস তরণী সেনের উল্লেখ করেছেন — সেটা মৌলিক। তরণী সেন বিভীষণ-সরমার পুত্র । এই পালায় কৃত্তিবাস ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন । তরণী মায়ের কাছে যুদ্ধে যাবার বাসনা প্রকাশ করলে — সরমা বলেন রাম বিষ্ণু অবতার । পুত্র যুক্তি দেয় "মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস ।" তাছাড়া —

কে পারে বধিতে কারে কেবা কার রিপু ।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু ॥

যুদ্ধে চলল তরণী। তার রথধ্বজে রাম নাম লেখা । 'অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে ।' সকলকে পরাজিত করে তরণী রামচন্দ্রের মুখোমুখি হল । রামের সর্বাঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করে তরণী — 'অষ্টাঙ্গ লুটায়ে ভূমে প্রণাম করিল ।' স্তব করতে লাগল । ভক্তের অধীন ভগবান রাম — ধনুঃশর ত্যাগ করলেন । ভক্তের অঙ্গে বাণ মারা অসম্ভব ।

কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে ।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ।।

তরণী বুঝল যে ভক্তকে আঘাত করবেন না রাম — রামহস্তে মৃত্যুবরণ করে বৈকুণ্ঠ-লাভ হবে না — তখন স্তব বন্ধ করে ধনুঃশর হাতে তুলে গালাগাল দিতে লাগল । রামও ধনুক তুললেন এবং বিভীষণের বুদ্ধিমতো ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তরণীকে বধ করলেন —

দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
তরণীর কাটা মুণ্ডে রাম রাম বলে ।।

বিভীষণের কান্না দেখে রাম তরণীর পরিচয় পেয়ে ব্যথিত হলেন ।

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ।।
ব্রহ্মা অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলা কানে ।
আপনি করিলা বধ আপন সন্তানে ।।

বিভীষণের উত্তর — রামের হাতে প্রাণ দিয়ে পুত্র ধন্য হল বৈকুণ্ঠ লাভ করল । বন্ধুভাবে সেবা থেকে শত্রুভাবে সেবায় — রামের বাণে নিহত হলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ লাভ হোতো অতিকায় কুম্ভকর্ণের মতো ।

শত্রুভাব করি সবে পাইল উদ্ধার ।
শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার ।।

তাছাড়া ব্রহ্মার বরে বিভীষণ অমর — তার বৈকুণ্ঠ লাভ আর হবে না । রামচন্দ্র বললেন —

যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন ।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ।।
যতদিন রবে তুমি অবনী ভিতরে ।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ।।

যাহোক তারপর বীরবাহু, ভস্মাক্ষ, ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন । কৃত্তিবাস বাল্মীকি কথিত কম্পন, প্রজঙ্ঘ শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ নামগুলি করেন নি । পক্ষান্তরে ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষর নাম করেছেন ।

তৃতীয় বার যুদ্ধে যাত্রা করলেন - ইন্দ্রজিত – প্রথমে-ই মায়াসীতা বধ করলেন। সীতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বিহ্বল হলেন রাম। নিরস্ত হল রামসৈন্য। বিভীষণ এসে বুঝালেন যে আসল সীতা নয় – মায়া সীতা। প্রধান যুক্তি রাবণ কদাচ সীতাকে বধ করতে দেবেন না। কৃত্তিবাসের বিভীষণ-ও তাই বলেছেন —

সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিত হেন সীতা পাইবে কেমনে ॥

একটু বেশি বলেছেন – হনুমান গিয়ে দেখে আসুক সীতাকে।

অশোকের বনে হনু হল উপনীত ॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।

বাল্মীকির বিভীষণ-ও বলেছিলেন – এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করছে – তা সম্পূর্ণ করলে অজেয় হবে। কাজেই এখুনি যজ্ঞাগারে আক্রমণ করতে হবে। এ কথা কৃত্তিবাসের বিভীষণ-ও বলেছেন রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে।

মায়া সীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥

ইন্দ্রজিত বধ কাহিনী - মোটামুটি মূলানুগ। তবে বর্ণনার রং ও মেজাজ বাঙ্গালী। যেমন

যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফল ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥

আবার শ্লোকের অনুবাদ-ও আছে --

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃশ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ (লঙ্কা ৮৭। ১৫)

নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥

ইন্দ্রজিতকে বধ করতে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগের সময় এই শপথ মাত্র উচ্চারণ করেছিলেন লক্ষ্মণ –

লক্ষ্মণ –

ধর্মাত্মা সত্য রামো দাশরথি যদি ।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহিরাবনিম্ ॥ (লঙ্কা ৯০। ৬৯)

কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের উক্তি –

বানেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিল সৃজন ॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু অবতার ।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥

শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত হলে অমাত্য সুপার্শ্ব স্ত্রীহত্যা করতে নিষেধ করে এবং রামকে বধ করে মৈথিলী লাভের উৎসাহ দেয় । তাতে বাল্মীকির রাবণ নিরস্ত হন । কিন্তু কৃত্তিবাসের রাবণকে বাধা দেন মন্দোদরী ।

উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন ।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী ।
ছি ছি মহারাজ বধ করো নাহে নারী ॥

তারপর রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা ও লক্ষ্মণ শক্তিশেল এবং হনুমানের গন্ধমাদন থেকে ঔষধ আনয়ন এবং লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ কাহিনীর বিবরণ ।

গন্ধমাদন পর্বত আনবার পথে বিস্তর বাধা ও অন্যান্য কৌতুককর বিষয়ের অবতারণা করেছেন কৃত্তিবাস । রাবণের কূট বুদ্ধিতে কালনেমি – গন্ধমাদনের পাশে সরোবর তীরে সাধু সেজে ছিল । সরোবরে ছিল গন্ধকালী কুমীর হয়ে । হনুমান সাধু দেখে তার উপদেশে স্নান করতে নামে ও কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হয় । কুম্ভীর বধ করে গন্ধকালীকে শাপমুক্ত করেন । গন্ধকালী কালনেমির আসল পরিচয় জানিয়ে দিলে – কালনেমিকে বধ করেন হনুমান । দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র করলেন রাবণ । রাত্রির মধ্যে বিশল্যকরণী আনতে না পারলে লক্ষ্মণের মৃত্যু নিশ্চিত। রাবণ সূর্যদেবকে আদেশ দিলেন উদয় হতে । সূর্যরথ আটকে দিলেন হনুমান । হনু-ভানুতে কথা হল - মিতালি ।

সূর্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি ।
সাপটিয়া সূর্যেরে সে পুরে কক্ষ তলি ॥

মহাতেজময় সূর্য রাখিতে কে পারে ।
আপনি হইল বন্দী লক্ষ্মণের তরে ।।

তৃতীয় বাধা গন্ধমাদনে গন্ধর্বরা রাত্রে নৃত্যগীত করে । হনুমান রামের কাহিনী বলে প্রার্থনা করলেন নৃত্যগীত বন্ধ করতে । কাজেই যুদ্ধ । গন্ধর্বদের নিধন করে চৌষট্টি যোজন পর্বত গোটাটা মাথায় নিয়ে চললেন হনুমান । দক্ষিণে চলতে ভরতের কথা মনে পড়ল । রামচন্দ্র ভরতের প্রশংসা করেন । তাঁকে দেখা দরকার । "রামের ভাই ভরতের বুঝে যায় বল ।"

হনুমান পর্বত নিয়ে একা নন্দীগ্রামের আকাশে । রামের পাদুকা লক্ষ্মন কারীকে শাস্তি দিতে বাটুল নিক্ষেপ করলেন ভরত — হনুমান মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । তাঁর মুখে রাম নাম শুনে ছুটে এল দুভাই । ব্রহ্মমন্ত্রে বশিষ্ঠ হনুমানের জ্ঞান ফেরালেন । হনুমান তখন সীতাহরণ-যুদ্ধ-লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা বললেন । কাঁদতে লাগলেন দু ভাই । ভরত যেতে চাইলেন লঙ্কায় । কিন্তু রামচন্দ্রের নির্দেশ নেই অথচ রাত্রের মধ্যেই যেতে হবে । ভরত বাণ দিয়ে সপর্বত হনুমানকে শূন্যে তুলে দিলেন । হনুমান লঙ্কায় এলে ওষুধ গুণে লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তি ঘটল । তারপর আবার পর্বতটিকে যথাস্থানে রেখে আসতে আকাশে উঠলেন হনুমান । রাবণ দেখলেন । সাতটা রাক্ষসকে পাঠালেন হনুমানকে মারতে । তারা আক্রমণ করল ।

হাত নাহি নাড়ে বীর পর্বত না ফেলে ।
পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে ।।

একজন কোনরকমে বেঁচে রাবণকে খবর দিল । হনুমান যথাস্থানে পর্বত রেখে — যে ওষুধে লক্ষ্মণ বেঁচেছেন সেই ওষুধ দিয়ে গন্ধর্বদের বাঁচিয়ে দিলেন । তারপর হনুমানের বগলে সূর্যকে দেখে রাম বিবরণ জানতে চাইলেন । হনুমান সব বিবরণ দিলে সূর্যকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হল । রাম সস্নেহে হনুমানকে আলিঙ্গন দিলেন — আর

এবারে আর একটি নতুন কাহিনী বললেন - কৃত্তিবাস মহীরাবণের। জননী নিকষা মহীরাবণের কথা মনে করালেন। পাতালে থাকেন পুত্র। স্মরণ করলেন রাবণ মহীরাবণকে। মহীরাবণ রামলক্ষ্মণকে হরণ করবেন ঠিক হল। বিভীষণ পরামর্শ শুনে রামলক্ষ্মণকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সবার চেষ্টা ব্যর্থ করে মহীরাবণ দুই ভাইকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গেলেন। শেষে হনুমান গিয়ে কৌশলে মহীরাবণ ও তার ছেলে অহিরাবণকে বধ করে লংকাতে নিয়ে এলেন রাম লক্ষ্মণকে । বিস্তৃত কৌতুকপ্রদ কাহিনী।

রাবণ তৃতীয়বার যুদ্ধে গেলেন। কৃত্তিবাসে বর্ণনা মূলানুগ। ইন্দ্রের রথে চেপে যুদ্ধ করলেন রাম। ভয়াবহ যুদ্ধের নিপুণ বর্ণনা দিতে গিয়ে নতুন কথা বললেন কৃত্তিবাস। রামের বাণাহত রাবণ – যোড় হাতে রামের স্তব করতে থাকলেন – "তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি –

জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
অপরাধ করিয়াছি সংখ্যা নাহি তার ॥
অপরাধ মার্জনা হে কর দয়াময়।

ভক্তবৎসল রাম - কি করবেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন – ভক্তকে মারা অসম্ভব। সীতা উদ্ধার হল না।

দেবগণ বিপন্ন হয়ে গেলেন সরস্বতীর কাছে। সরস্বতী রাবণের কণ্ঠে বসলেন। সুর পালটে গেল রাবণের। রামকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হল।

কিন্তু রাবণকে যে মারা যায় না।

শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিয়া মাত্রই ওঠে তিল নাহি বাধা ॥

তারপর ভয়ংকর যুদ্ধে - রাবণ চণ্ডিকাস্তব করলেন। অভয় দিলেন দেবী। দেবীকে রাবণের রথে দেখে হতাশ হলেন রাম। শেষে ব্রহ্মা অকালবোধন করে দেবীর পূজার নির্দেশ দিলেন রামকে। শারদীয়া নবমীতে অষ্টোত্তর শত নীলোৎপলে দেবীর অর্চনা করতে হবে। রাম দেবীর স্তব করলেন। দেবীদহ থেকে নীলপদ্ম আনা হল। কিন্তু দেবী একটি হরণ করলেন। তখন কমল লোচন রাম

নিজের একটি চক্ষু দিয়ে পদ্মসংখ্যা পূরণ করতে গেলে দেবী প্রসন্ন হয়ে বর দিলেন রামকে ।

কিন্তু রাবণের পূজাতে যাতে চন্ডীপাঠ শুদ্ধ না হয় তার চেষ্টাও দেখতে হবে । বৃহস্পতি চন্ডীপাঠ করছেন রাবণের পূজাতে । হনুমান মক্ষিকা হয়ে চেটে নিলেন কয়েকটা অক্ষর । অভ্যাস মতে পড়ে গেলেন বৃহস্পতি । তখন নিজরূপ ধরে পুথি কেড়ে নিলেন হনুমান ।

প্রথম মাহাত্ম্য স্তোত্র, মুছে ফেলে তিন শ্লোক
চন্ডী হইল অশুদ্ধ তখন ।

তারপর আরও কঠিন সমস্যা বিভীষণ জানালেন যে ব্রহ্মা রাবণকে একটি মৃত্যুবাণ দিয়েছিলেন তপস্যার কালে । সে বাণটি রাবণ রেখেছেন মন্দোদরীর জিম্মায় । সেটি না হলে রাবণবধ অসম্ভব । কে আনবে সে বাণ ? হনুমান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে মন্দোদরীকে প্রতারণা করে নিয়ে এলেন মৃত্যুবাণ । এবার রাবণ বধ হল । এই কাহিনী কৃত্তিবাসের । বাল্মীকিতে আছে অগস্ত্য আদিত্য হৃদয় স্তব শিখিয়ে দেন রামকে । রাম সেই স্তব করে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাবণ বধ করেন ।

মৃত্যুর পূর্বে রাবণ রামচন্দ্রকে যে রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন – সেটিও কৃত্তিবাসী কাব্য । দুইটি উপদেশ –

করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে ।
অনস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ।

রাবণ নরককুন্ড বন্ধ করা, স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করা আর লবণ সাগরকে ক্ষীরোদ সমুদ্রে পরিণত করা – এই তিনটি শুভকাজ করে উঠতে পারেন নি । আবার পাপ-কর্ম সীতাহরণ বিচার না করে বালবিলম্ব না করে করেছেন । আসলে এই কথা প্রাচীন নীতিরই উপস্থাপন –

'শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণম্ ।'

রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের এবং মন্দোদরী প্রমুখ রাণীদের শোক । রাবণের অন্তিম সংস্কার, বিভীষণের অভিষেকাদি ও সীতার অগ্নিপরীক্ষাদি বৃত্তান্ত মূলানুগ ।

কেবল কিছু নূতনত্ব দিয়েছেন কৃত্তিবাস – দু' একটি স্থানে। যেমন – রামকে প্রণাম করলেন মন্দোদরী।

সীতা বলি রামচন্দ্র ডাকিয়া তাহারে।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্বাদ করে॥

কিন্তু রাবণ তো মৃত - কীভাবে আয়ুষ্মতী থাকবেন মন্দোদরী ? মীমাংসা –

রাবণের চিতা বহিবে সর্বথা
চিরকাল রবে আয়াতে।

চিতা না নিভানো পর্যন্ত পত্নীর বৈধব্য হয় না। এই প্রসঙ্গে রাবণের চিতা এই বাগ্ বিধিটিও স্মরণীয়।

পরবর্তী কাহিনী সীতার অগ্নিপরীক্ষা মোটামুটি মূলানুগ বর্ণনা কেবল একটি স্থলে ছাড়া। কৃত্তিবাসের মন্দোদরী পতি দর্শনে যাবার পথে সীতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন —

মন্দোদরী বলে শুন জনক নন্দিনী
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।
পুত্রসহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে।
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ হবেনা লঙ্ঘন॥

সীতার অগ্নি প্রবেশের পর বাল্মীকির রাম বাহ্যিক কোন আর্তি প্রকাশ করেন নি - কৃত্তিবাসের রাম শেষে "ভূমি পড়াপড়ি যান হইয়া বিকল।"

মহাদেবাদি দেবগণের আবির্ভাব এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা। শেষে ইন্দ্রপুর থেকে দশরথের আগমনাদি বিবরণ। রামের প্রার্থনায় মৃত বানর ভল্লুকদের বাঁচিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্ত মূলানুগ কিন্তু এখানেও একটি কৃত্তিবাস-কূট আছে। ইন্দ্র সুধাবৃষ্টি করেছিলেন সকল মৃত বানর-রাক্ষসদের উপর।

বানরেরা বেঁচে উঠল – রাক্ষসরা প্রাণ পেল না কেন ? কৃত্তিবাস বলেছেন মৃত্যুকালে ভগবানের নামকীর্তনে স্মরণে স্বর্গবাস হয় । বানররা 'রাবণকে মার' এই শব্দ বলে মরেছে । তাই মুক্তি পায়নি কিন্তু –

রাম মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস ।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ।।

নাম মহিমা কীর্তনের কোন সুযোগ কৃত্তিবাস ব্যর্থ হতে দেন নি ।

তারপর রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও অভিষেকাদি বর্ণনা । বাল্মীকির কাঠামোটা ঠিক থাকলেও ব্যতিক্রম ও কৃত্তিবাসের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় । পুষ্পক রথে চেপে যাত্রা করেছিলেন সবাই – সীতাকে রামচন্দ্র বিভিন্ন স্থানগুলি দেখালেন । কৃত্তিবাস রামের লঙ্কাত্যাগের পূর্বে বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের আপ্যায়ণ ও মহাভোজের এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন । রামের শিবপূজা, লক্ষ্মণ কর্তৃক লঙ্কাসেতু ভঙ্গ কৃত্তিবাসের কথা । প্রত্যাগমন পথে বাল্মীকি বলেছেন সীতার ইচ্ছায় কিষ্কিন্ধ্যা থেকে সুগ্রীবের পত্নীদিগকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং ভরদ্বাজাশ্রমে এসে ভরতের মন অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব করে রাজপদের প্রতি আসক্তি এসেছে কিনা গোপনে তা জানবার জন্য ছদ্মবেশে হনুমানকে পাঠাবার কথা আছে । কৃত্তিবাস তা বলেন নি । ভরদ্বাজাশ্রমের ভোজের কথা আছে হনুমানের দৌত্যের কথাও আছে - তবে সেটা রামায়ণ বর্ণনা । কৃত্তিবাস কৈকেয়ী প্রসঙ্গে বলেছেন । অনুতপ্তা কৈকেয়ী মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে যদি রাম আগের মতো মা বলে না ডাকে তবে তিনি দেহত্যাগ করবেন বিষপানে । রাম তাই প্রথম এসেই কৈকেয়ীর কাছে যান । কৈকেয়ীর অভিযোগ –

বনে গেলে দেবতার অর্থসিদ্ধি লাগি ।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ।।

কৃত্তিবাস বানরগণের সীতারাম কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ ও ভোজন হনুমানের রামনাম প্রদর্শনের বর্ণনা করেছেন ।

সীতা নিজের হারটি হনুমানের গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেন –

সীতা বলে যত কাল থাকিবে পৃথিবী ।
রোগ পীড়াহীন বাপু হও চিরজীবী ।।
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্যের প্রভার ।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ।।
তাবৎ হও হে তুমি অক্ষয় অমর ।

হারটি কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেন হনুমান । লক্ষ্মণ পরিহাস করলেন বানরের গলায় রত্নহার । হনুমান বললেন যাতে রামনাম নাই তা বর্জনীয় । লক্ষ্মণ বললেন তাহলে তো হনুমানের দেহত্যাগ করতে হয় — দেহে কি রামনাম আছে ?

এতেক শুনিয়া তবে পবন কুমার ।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার ।।
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ ।।

উত্তর কান্ড : — বাল্মীকির উত্তর কান্ডের সর্গ সংখ্যা ১১১ । বিভিন্ন কান্ডের সর্গসংখ্যার বিচারে উত্তরকান্ডের স্থান তৃতীয় । আয়তনের দিক থেকে কৃত্তিবাস উত্তরাকান্ডের সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন — লঙ্কাকান্ডের পরই উত্তরাকান্ডের স্থান । উত্তর কান্ডের বিষয়বস্তুর দুটি ভাগ — একটি পূর্বকথা - রাক্ষসাদির জন্ম - কর্ম - ধর্ম, অপরটি রামকথার উপসংহার, সীতার বনবাস - পাতাল প্রবেশ ও রাঘব ভ্রাতৃচতুর্গণের পার্থিব লীলাবসান ।

রাম রাজার সভাতে অগস্ত্যাদি মুনিরা সমবেত হলেন এবং রাবণাদি বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য বিশেষ প্রশংসা করলেন । রাক্ষসাদির উদ্ভব রাবণাদির জন্ম তপস্যা বরলাভ দিগ্বিজয়, কুবের বিজয়, বেদবতী উপাখ্যানের [illegible] অনরণ্য, যম, নিপাত কবচ, বরুণ, বলি, সূর্য্যলোক, কৈলাস, ইন্দ্র, কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, বালি ও মান্ধাতার ও বলির কাছে রাবণের পরাজয় হয়েছিল । অকামা নারীকে রাবণ ধর্ষণ করলেই মৃত্যু হবে রাবণের এই অভিশাপের কথা, হনুমান, বালী সুগ্রীবের বৃত্তান্ত — এই অংশ পূর্বকথা । দ্বিতীয়াংশ সীতার গর্ভলক্ষণ বনবাস বাল্মীকির আশ্রমে কুশ-লবের জন্ম ও শিক্ষালাভ । শত্রুঘ্নের লবণাসুর বধ । শম্বুকের

শিরশ্ছেদ, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, কুশলবের রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন, রামের মহাপ্রস্থান। অবশ্য এই অংশে-ও পূর্বকথা না হলে-ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক রূপকথা – গৃধ্র ও উলূকের কাহিনী, সৌদাস কাহিনী, অগস্ত্যের কথা, সূদেবপুত্র শ্বেতের উপাখ্যান - দণ্ডকারণ্য কথা ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ড-ও মূলগ্রন্থের আদর্শে ও ক্রমে রচিত। প্রথমাংশে পূর্বকথায় রাক্ষসগণের জন্ম ও রাবণের জয় পরাজয় - বর ও শাপ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত ও হনুমানের কথা এবং দ্বিতীয়াংশে রামকথার উপসংহার, সীতার বনবাস, লবকুশের জন্ম – রাম রাজত্ব শম্বুক বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, স্বর্ণসীতা নির্মাণ, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন ও তিন ভ্রাতার মহাপ্রস্থান। অবশ্য এই অংশে-ও কৃত্তিবাসের নিজস্বতা – কি কাহিনী উদ্ভাবনে কি বর্ণনায় ও বিন্যাসে উপভোগ্য।

অগস্ত্যাদি মহর্ষিরা রামের সভায় এসেছেন। ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ বধ করেছেন কাজেই "কাজেই লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবন"। কারণ ইন্দ্রজিত বধ এক অসাধ্য সাধন।

চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দ বর্ষ স্ত্রী মুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দ বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেইজন পারে ॥

রাম বিস্মিত হলেন লক্ষ্মণ কি এইসব ব্রত করেছেন ? এবার লক্ষ্মণ জবাব দিলেন – সীতা-রামের সঙ্গে একত্র বাস করে-ও লক্ষ্মণ কখনো সীতার মুখের দিকে তাকান নি – পায়ের দিকে চোখ রেখেছেন। প্রমাণ ? ঋষ্যমূক পর্বতে সীতার পরিত্যক্ত আভরণ-গুলি দেখিয়ে –

সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি চিনহ লক্ষ্মণ ॥
আমি না চিনিনু তাঁর হার কি কেয়ূর।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর ॥

নিদ্রা ? — রাম সীতা কুটিরে থাকতেন । সারা রাত ধনুর্বাণ হাতে কুটির দ্বারে জেগে থাকতেন লক্ষ্মণ —

আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে ।
ভেদিব করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥
কহি শুন নিদ্রা দেবি আমার উত্তর ।
এসো না মোর কাছে এ চৌদ্দ বৎসর ॥

আর আহার ? রাম তো নিজের হাতে লক্ষ্মণকে ফল দিয়েছেন প্রতিদিন —

পড়ে কিনা পড়ে মনে রাজীব লোচন ।
আমাকে কহিতে ফল ধররে লক্ষ্মণ ॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটিরেতে আনি ।
খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমণি ॥

তূনীরের মধ্যে ফল আছে । এখানে আরও কৌতুক সৃষ্টি করেছেন কৃত্তিবাস । হনুমানকে পাঠানো হল । সামান্য হালকা তূণ । এ এ কাজে হনুমানকে পাঠানো হল ? অহংকার হল হনুমানের । কাজেই তূণীর এত ভার হল যে হনুমান তুলতে পারল না । শেষে লক্ষ্মণ বাঁ হাতে তুলে আনলেন তূণীর । গণনা করা হল — ৭টি ফল কম । লক্ষ্মণ হিসাব দিলেন — বাবার মৃত্যুসংবাদের দিন, সীতাহরণের দিন, নাগপাশে বন্ধনের দিন, মায়াসীতা বধের দিন, মহীরাবণের পাতালে একদিন, শক্তিশেলের দিন — আর রাবণ বধের আনন্দের দিন - সাতদিন ফল আনা হয়নি ।

কাহিনী বর্ণনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির ক্রমভঙ্গ করেছেন । আদি কবি আগে কুবেরের ওপরে রাক্ষসকে জন্মকথা বলেছেন—কৃত্তিবাস বলেছেন আগে রাক্ষসদের । গজকচ্ছপের কাহিনীটি কৃত্তিবাসের সংযোজন । আদি রামায়ণে নাই । তবে মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে আছে । মালী প্রভৃতির কাহিনী মোটামুটি এক । কোথাও নামের পার্থক্য আছে । কুবেরের মাতার নাম বাল্মীকি বলেছেন দেববর্ণিনী কৃত্তিবাসের মতে লতা । ঘাল্যবান রূপবতী কন্যা নিকষাকে (বাল্মীকি কৈকেসী বলেছেন) বিশ্রবা মুনির কাছে পাঠালেন পুত্রবরের জন্য । তার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও

শূর্পনখার জন্ম হল। তারপর তিন ভ্রাতার কঠোর তপস্যার বর্ণনা। রাবণ বর পেলেন নর বানর ছাড়া সকলের অবধ্য, বিভীষণ হলেন অক্ষয় অমর। কুম্ভকর্ণের কন্ঠে সরস্বতী ভর করে বলালেন –

'কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর।'

তারপর রাবণ কুবেরকে লংকা থেকে বিতাড়িত করে পুষ্পক বিমান দখল করলেন। রাবণাদির বিবাহ। মেঘনাদের জন্ম, কৈলাসে নন্দীর বানরমুখ দেখে উপহাস। নন্দীর অভিশাপ --

দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।<br>
এ বানর করিবে তোর সর্বনাশ ॥

তারপর বেদবতীর কাহিনী ও অভিশাপ। বেদবতীকে কেশে ধরে অপমান করার ফলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিল বেদবতী –

নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে।<br>
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥

বেদবতী সীতা হয়ে জন্মালেন। তারপর মরুত রাজার যজ্ঞস্থলে এসে হামলা করলেন। মরুত যুদ্ধ করলেন না। কাজেই জয়ী ঘোষণা করলেন রাবণ। দেবতারা রাবণের ভয়ে আত্মগোপন করলেন –

ইন্দ্র হল ময়ূর, কুবের কাকলাস।<br>
যম কাক রূপ হয় বরুণ সে হাঁস ॥

বাল্মীকি সম্মত অনুবাদ। অনরণ্য রাবণকে শাপ দিলেন যে তাঁর বংশধরের হাতে রাবণের মৃত্যু। রামচন্দ্র এই বংশের সন্তান। তারপর কার্তবীর্যার্জুন ও বালির কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হলেন রাবণ। যাহোক ইন্দ্রজিতের সাহায্যে স্বর্গ বিজয় দিয়ে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনা শেষ করেছেন কৃত্তিবাস। ইন্দ্রের কোন পাপে পরাজয়? ব্রহ্মা বললেন – 'অহল্যা ধর্ষণ।' কী সে মুক্তি হবে পাপ থেকে?

বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কানে।<br>
রামনাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রি দিনে ॥<br>
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।<br>
রামনামে হয় সর্ব পাপের সংহার ॥

তারপর অগস্ত্য হনুমানের জন্মকথা বলেন । এই সঙ্গে পুরা কথার শেষ । বাল্মীকি অবশ্য বালি সুগ্রীবের জন্মকথা-ও বলেছেন ।

এবারে রামকথার প্রারম্ভে কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন বিশ্বকর্মা নির্মিত অযোধ্যায় অশোক কানন যুক্ত বিলাস ভবনে রামসীতার বিহার । সীতার গর্ভধারণ । গঙ্গাতীরে ঋষিদের সঙ্গে এক রাত্রে বাসের সাধ করেছিলেন সীতা । রাম-ও কথা দিয়েছিলেন — কাল তাঁকে পাঠাবেন । কৃত্তিবাসের রাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "কোন দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ ।" সীতা বলেন যমুনাতে দণ্ড শুদ্ধ পিন্ড খেতে সাধ । এক মুনিপত্নীকে সীতা কথা দিয়েছিলেন । তার সঙ্গে দেখা করবেন ।

এই সত্য পালি পরে দেহত মেলানি ।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ।।
বিস্ময় মানিয়া রাম কহেন তখন ।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন ।।

পরদিন সকালে-ই ভদ্র নামক গুপ্তচরের মুখে সীতার অপবাদ শোনেন এবং ভাইকে ডেকে সীতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । কৃত্তিবাসের বিবরণে আছে — আরো

এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্মুখ ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ।।

তারপর রাম যান স্নান করতে পুকুরে সেখানে রজকদের কলহে শোনেন —

পৃথিবীর রাজা রাম সমুরিতে পারে ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ।। ইত্যাদি

এই রজক প্রসঙ্গ রামায়ণে নাই আছে জৈমিনী ভারতে । বিমর্ষ রাম ঘরে এসে দেখেন আর একটি চিত্র । রাবণের চিত্র আঁকা মেজেতে আর সীতা তার পাশে শুয়ে আছেন । যাদের অনুরোধে রাবণ দেখতে কেমন তা দেখাতে —

হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ ।
দশমুন্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ ।।

তারপর অন্তঃসত্তার আনন্দে হাই তুলে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েন সেখানে । মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের চিত্র । রাম সীতা সম্মুখে সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে তাঁকে বিসর্জন দেন । সীতার বনবাস, লবণ দৈত্যবধ, শম্বুক বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞকথা, স্বর্ণসীতা ইত্যাদি কাহিনী মূলানুগ তবে বর্ণনার মধ্যে কৃত্তিবাসী বৈশিষ্ট্য আছে ।

মথুরায় লবণ দৈত্য বধ করার পথে শত্রুঘ্ন যে রাত্রে বাল্মীকি আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন — তখনই সীতার যমজ পুত্র হয় —

লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে ।
লব দেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ॥

শম্বুক বধের পর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন । স্বর্ণসীতা তৈরী করেছিলেন । এই অনুষ্ঠানে বাল্মীকি লবকুশকে নিয়ে এসে রামায়ণ গান শোনান । সীতার পুত্র লবকুশ । সীতাকে আনেন বাল্মীকি । রাজসভাতে সীতা এনে বাল্মীকি তাঁর পবিত্রতা সম্মুখে সাক্ষ্য দিলেও রাম সীতাকে লোকাপবাদ ভয়ে আবার পরীক্ষার কথা বলেন । সীতা তখন শপথ বাক্য উচ্চারণ করে পাতাল প্রবেশ করেন ।

মূল রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণের পার্থক্য আছে । কৃত্তিবাস অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া - লবকুশ কর্তৃক বন্ধন এবং শত্রুঘ্ন ভরত লক্ষ্মণ, পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ এবং হনুমান জাম্বুমান সহ রামচন্দ্রের মূর্ছা । লবকুশের কাছে রামের অলংকার ও হনুমান জাম্বুমানকে দেখে সীতা রণক্ষেত্রে রামচন্দ্র নিহত হয়েছেন ভেবে দুই পুত্রসহ অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করছেন এমন সময় বাল্মীকি এসে সকলকে বাঁচিয়ে দেন — এই কাহিনী আছে জৈমিনী ভারতে (২৫ - ৩৬ অধ্যায়) এবং পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে । কৃত্তিবাস জৈমিনী ভারত থেকেই গ্রহণ করেছিলেন । লবকুশের যুদ্ধ বর্ণনা শেষ করে লিখেছেন —

এ সব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে ।
সম্প্রতি যে কিছু নাই বাল্মীকির মতে ॥

যজ্ঞস্থলে বাল্মীকির সঙ্গে এসে লব কুশের রামায়ণ গান থেকে অবশিষ্ট অংশে মূল রামায়ণ অনুসৃত হয়েছে তবে মধ্যে মধ্যে কৃত্তিবাস নিজের কল্পনার স্পর্শ দিয়েছেন যেমন সীতার আর পরীক্ষা না নিবার জন্য —

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী ।
রামেরে বাখান তিন রাজার গৃহিণী ॥

ইত্যাদি বিবরণ । বাল্মীকির রামায়ণে পাতাল প্রবেশের মুখে সীতা যে ত্রিসত্য উচ্চারণ করেছিলেন – তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অসাধারণ –

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি ॥
মনসাকর্মনাবাচা যথা রামং সমর্চয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মিরামাৎ পরং ন চ ।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ (উত্তর ৯৭।১৪-১৬)

সীতার শপথ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে নাগবাহিত রথে এলেন পৃথিবী, সীতাকে বুকে তুলে নিয়ে – পাতালে অন্তর্হিত হলেন । এর তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনার কোন তুলনাই চলে না । বাঙালী ললনার সাভিমান করুণ কণ্ঠে সীতার ১৮টি পয়ারে সীতার শেষ উক্তির কিছু অংশ এই রকম –

পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব বিদ্যমানে ।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলা আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস ।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
মহাদেবী হইতে মুনির ঘরে বসি ।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান ।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥
*** *** ***
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে ।

সভায় পরীক্ষা দিতে আমি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি ।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥
*** *** ***
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ ।
কন্যার হইলে লজ্জা তোমার যে লাজ ॥
*** *** ***
উদরে ধরিলে মোরে তাকি মনে নাই ।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাই ॥

মূর্তিমতী পৃথিবী সুবর্ণ সিংহাসন সহ আবির্ভূত হয়ে সীতাকে কোলে নিলেন – বললেন জামাই-এর উদ্দেশে –

পরীক্ষা করিতে চান্ লোকের কথায় ।
লোক লইয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥
মায়ে-ঝিয়ে দুইজন থাকিব পাতালে ॥

সীতা পুত্রদের দিকে তাকালেন না। রামের দিকে তাকিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন –

পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে ।
হস্তে চুল মুঠা রৈল সীতা গেল তলে ॥

তারপর লক্ষ্মণ বর্জনাদি এবং রামচন্দ্রের ভরত শত্রুঘ্ন সহ মহাপ্রস্থান বর্ণনা মোটামুটি মূলানুগ ।

বাল্মীকি রামায়ণ মাহাত্ম্য দিয়ে উত্তরকান্ড তথা রামায়ণ শেষ করেছেন । কৃত্তিবাসও রাম মহিমার কথা বলেছেন – কিন্তু তার আগে একটি কাব্যপূর্ণ তাৎপর্য উল্লেখ করা যাক । আদিকান্ডে রামায়ণ সুরু হয়েছিল নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশের মধ্য দিয়ে – উত্তর কান্ডে সেই চারকে এক বিষ্ণু দেহে লীন করেছেন কৃত্তিবাস –

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন ।
মিলি হইলেন এক দেহ নারায়ণ ॥

সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে ।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥

তারপর রামনাম মহিমা –

চারি বেদ সহস্র নামে যত ফল হয় ।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয় ॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ ।
সর্ব পাপ মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্র ফল ।
সপ্ত কান্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥

## চরিত্র বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে – রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য ।" (খ) ভারতবর্ষের পটভূমিকায় রামায়ণের যে আলোচনা ও বিচার তা বাল্মীকির রামায়ণ । চরিত্রগুলির বিচার বিশ্লেষণও মূল রামায়ণের ভিত্তিতেই কৃত । তা নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথা, সুখময় ভট্টাচার্যের রামায়ণের চরিতাবলী, অমলেশ ভট্টাচার্যের রামায়ণকথা প্রমুখ অনেক গ্রন্থ বাংলাতে রচিত হয়েছে – তার আধারও বাল্মীকি রামায়ণ । কৃত্তিবাসী রামায়ণের তথা প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থের চরিতাবলী নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ রচনার গ্রন্থ খুব একটা চোখে পড়েনি । তার প্রথম কারণ - গ্রন্থগুলি অনুবাদ কাহিনীর মতো - চরিত্রগুলিও মূল চরিত্রের আধারে বর্ণিত । তবে কবির মানসিকতা ও দক্ষতা ভেদে চরিত্রগুলির মধ্যে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় । কবি-মানস স্থান কালের অধীন – এবং মূলতঃ জাতীয় তথা আঞ্চলিক ও লৌকিক সংস্কারও সংস্কৃতি দ্বারা অভিষিক্ত । কাহিনী বিন্যাসে অভিনবত্ব আঞ্চলিক কবিরা সৃষ্টি করে থাকেন, চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে । কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর রামায়ণ । তার মধ্যে বাঙালীর সমাজ প্রতিফলিত চরিত্রগুলির মধ্যেও বাঙালী আবেগ ও আচরণাদি প্রতিবিম্বিত । এই সূত্র অবলম্বন করেই কৃত্তিবাসের কলমে বাল্মীকি চিত্রিত চরিত্রের

যে অভিনব ব্যঞ্জনা রূপায়িত হয়েছে তার পর্যালোচনা করা যায়।

দশরথ - প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তৎকালীন জীবনবোধ অনুসারে রাজধর্ম পালন বশ মর্যাদা রক্ষা, বহুপত্নী ও ভোগের মধ্যে জীবনযাপন তৎকালের বিশ্বাসানুযায়ী সামাজিক দায়িত্ব পালন করে দেহত্যাগ করা – এই ছিল আদর্শ। বহুমহিষীর মধ্যে তরুণী তথা সুন্দরী কৈকেয়ীর দশরথের প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি-বিশেষ আনুগত্য। নিঃসন্তান রাজা যথাযথ ধর্মানুসরণ করে পুত্র লাভ করলেন দৈব কৃপায়। প্রধানা তিন স্ত্রীকে পুত্রবতী করার জন্য যজ্ঞলব্ধ পায়েস বা চরু ভাগ করে দিলেন। বাল্মীকির দশরথের সঙ্গে কৃত্তিবাসের দশরথের এই চার ভাগ করা ব্যাপারে অনৈক্য আছে। মূল রামায়ণের দশরথ পায়েসের অর্ধেক দিয়েছিলেন কৌশল্যাকে, বাকি অর্ধেকের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে, এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশের অর্ধেকটা কৈকেয়ীকে এবং বাকি অর্ধেক আবার সুমিত্রাকে দিলেন। অর্থাৎ ষোল আনার মধ্যে কৌশল্যা পেলেন আট আনা, সুমিত্রা চার + দুই = ছয় আনা, আর কৈকেয়ী দুই আনা।(দ) কৃত্তিবাস লিখেছেন –

কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁর মধ্যা দুইরানী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলা দশরথে।
হেন কালে সুমিত্রা সে লাগিল কাঁদিতে॥

দয়াবতী কৌশল্যা তাঁর ভাগ থেকে অর্ধেক দিলেন সুমিত্রাকে, শর্ত – সুমিত্রার সন্তান "আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন।" দেখাদেখি কৈকেয়ী-ও অনুরূপ শর্তে সুমিত্রাকে চারের অর্ধাংশ দিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী এক চতুর্থাংশ করে আর সুমিত্রা পেলেন দুইভাগের অর্ধাংশ।

দশরথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ছিলেন রাম। এই প্রিয়ত্বের পক্ষপাতিত্ব দেখাতে কৃত্তিবাস একটি নতুন কাহিনী তৈরী করেছেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষস নিধনের জন্য রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করতে এলে দশরথ রামকে লুকিয়ে রেখে ভরত শত্রুঘ্নকে

পাঠিয়েছিলেন । দশরথের মনোভাব —

প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি ।
এক দন্ড রামচন্দ্র না দেখিলে মরি ।।

আদি রামায়ণের দশরথও রামান্ত প্রাণ [redacted] কৃত্তিবাসের এই রামায়ণের দশরথও রামান্ত প্রাণ, কিন্তু কৃত্তিবাসের এই বিশ্বামিত্র প্রতারণা কাহিনী তাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে । তাছাড়া কৈকেয়ী রূপমুগ্ধ, পুত্রগত প্রাণ, সত্যনিষ্ঠ রাজার যে চরিত্র বাল্মীকি এঁকেছেন – কৃত্তিবাস তার সার্থক অনুসরণ করেছেন ।

কৌশল্যা – প্রধানা মহিষী, গুণবতী । কৈকেয়ীর রূপযৌবনাধীন হলেও দশরথের অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি ছিল কৌশল্যার প্রতি অটুট । কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় প্রথমেই দশরথের মনে পড়েছিল কৌশল্যার কথা । কৌশল্যা যে একাধারে রাজার দাসী, সখী, ভার্যা, ভগিনী ও মায়ের মতো –

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ ।
ভার্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি ।। (ধ)

কৃত্তিবাসেও এই মর্যাদা যথার্থ রূপায়িত হয়েছে । স্বামীর অনিবার সান্নিধ্য না পেলেও কৈকেয়ীর প্রতি স্বামীর প্রবল আসক্তি জেনেও, তিনি প্রধানা পত্নী হিসাবে কোন হীন চাঞ্চল্য দেখাননি, পত্নীর দায়িত্ব পালন করেছেন । রামের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার আনন্দ ও বনবাসের বিষাদ – একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়ার ফলে যে কর্তব্য-সংকট, যে আর্তি মৃত্যুর মতই এসেছিল কৌশল্যার জীবনে বাল্মীকি তার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন – কৃত্তিবাসও তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন । সব মায়ের চরিত্র-ই এক ছাঁচে ঢালা – তবু দেশ ও জাতি ভেদে তার প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য থাকে । বনগমনকালে কৃত্তিবাসের কৌশল্যার পুত্রের জন্য কাতর প্রার্থনা বাঙালীমনের দরদে ভরা ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্তিক গণপতি ।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ।।
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি ।
জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুণ পৃথিবী ।।

কৈকেয়ী — রামায়ণে নিন্দিত চরিত্র। কিন্তু মানবিকতা গুণহীনা নয়। রূপযৌবনের দাক্ষিণ্যে কৈকেয়ী স্বামীর প্রিয়তমা, তবু সমগ্র অন্তঃপুরের মহিষী হিসাবে কৌশল্যাকে শ্রদ্ধা করে। এইখানে কৈকেয়ীর কোন স্থান নাই, কিন্তু তার জন্য প্রবল আকাঙ্খা আছে। এইটা তাঁর গভীর ঈর্ষার উৎস। মন্থরা এইখানে যোগ দিয়েই কৈকেয়ীকে কাবু করেছিল — রাজমাতা কৌশল্যার অধীনে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই রামকে রাজা হতে দেওয়া যায় না — এইজন্য যা কিছু করা দরকার কৈকেয়ী তা সব করেছেন। অটল ভাবে নির্মমভাবে অন্যকিছু বিবেচনা না করে। বাল্মীকির হাতে কৈকেয়ী নিষ্ঠুরতারও স্বার্থপরায়ণার নিখুঁত চিত্র। কৃত্তিবাস তার অনুসরণ করেছেন মাত্র। পিতার মৃত্যুর পর ভরতের অযোধ্যা আগমন ও সবকিছু শুনে কৈকেয়ীকে ভৎর্সনার পর কৈকেয়ী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন - বাল্মীকি অঙ্গুলি সংকেতে তাঁকে দেখিয়েছেন মাত্র। রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভরত যখন যাত্রা করেন তখন কৌশল্যা সুমিত্রার সঙ্গে কৈকেয়ীও গিয়েছিলেন। ভরত ক্ষোভের সহিত তার পরিচয় জানিয়েছিলেন রূপগর্বিতা, ধনগর্বিতা নিষ্ঠুরা দুর্ভাগিনী জননী — বলে সকলের সঙ্গে। কৃত্তিবাস এই অমর্যাদা থেকে কৈকেয়ীকে রক্ষা করেছেন। কৃত্তিবাসের রচনায় কৈকেয়ী যান নি ভরতের সঙ্গে —

কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে ॥

আরও সহানুভূতি দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস। বনবাস থেকে রাম যখন ফিরেছেন অনুতপ্তা কৈকেয়ী তখন নির্জনে অন্তঃপুরে বসে ভাবছেন —

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষ পান করে ॥

রাম এসে প্রথমেই কৈকেয়ীকে প্রণাম করছেন। লীলাবাদে বিশ্বাসী ভক্ত কবি কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী বলেছেন —

বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥

সীতা – চরিত্র ভারত নারীর – পতিপ্রাণতার, পাতিব্রাত্যের সর্বাতিশায়ী দাম্পত্য প্রেমের চির-তন আদর্শ । যুগভেদে এই চরিত্রের বিশ্লেষণ বিচারে ও মূল্যায়নে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু রামায়ণে এবং তার অনুবাদ সাহিত্যে – তাঁর রূপের কোন পরিবর্তন বা নবায়নের সুযোগ নেই, তবে তার চরিত্রানুগ স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যাখ্যা সূত্রে – কিছু বিস্তার করা মাত্র সম্ভব । কৃত্তিবাসে সীতার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন – শ্রীরামের রূপমুগ্ধ সীতা –

দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে ।
স্বামী করে দেহ রাম কমল লোচনে ॥

সীতাচরিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুহূর্ত সমূহকে পাঁচটি অংকে ভাগ করা যায় – রামের সঙ্গে বনগমন সংকল্প, মায়ামৃগ প্রসঙ্গে ও সীতাহরণ, অশোকনে, অগ্নি পরীক্ষা, বনবাস ও পাতাল প্রবেশ । বাল্মীকি এই নাটকীয় মুহূর্তগুলি অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্যে মন্ডিত করেছেন – কৃত্তিবাস ঘটনাগুলির সার্থক অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু তার গাম্ভীর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারেন নি । সবকিছুর মধ্যেই সীতা বাঙালী বধূ – স্বামী সোহাগিনী, অভিমানিনী, একান্ত পতিগত প্রাণা নারীরূপে চিত্রিতা । মাটির মেয়ে জানকী স্বামীর সব কথা, আচরণ, ব্যবহার নির্বিবাদে গভীর ধৈর্যের ও বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন । এটাই তাঁর গৌরব ও একমাত্র ধর্ম । এই সর্বংসহা সহধর্মিণীর আদর্শ-ই সীতাচরিত্রে প্রতিষ্ঠিত । মাঝেমধ্যে কেবল বাঙালী নারীর বা বধূজনোচিত ভাষা সংস্কার আবেগ-আচরণাদিতে কৃত্তিবাস কিছু অভিনবত্বের তথা বাঙ্গালীত্বের রং দিয়েছেন । সর্বত্রই বাল্মীকির প্রতিধ্বনি, তবে ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা অন্য সুর যেমন – লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করতে অরণ্যকান্ডে উক্তি –

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন ।

অগ্নি পরীক্ষার পূর্বে লঙ্কাকান্ডে —

বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে ।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥

পাতাল প্রবেশের পূর্বে –

আজ হইতে তোমার ঘুচুক লাজ দুখ ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥

জন্মে জন্মে প্রভু তুমি হয়ো মোর পতি ।
আর কোন জন্মে মোর কোরো না দুর্গতি ॥

নারী চরিত্রের মধ্যে তারা ও মন্দোদরী এই দুইজনের চরিত্র আলোচ্য । তারা বালীর পত্নী – বানর রাজ্যের রাণী এবং রাজপুত্র অঙ্গদের জননী । মায়াবী দানবের হাতে বালী নিহত হয়েছে এই সিদ্ধান্তের পর সুগ্রীব যখন কিষ্কিন্ধ্যাতে সিংহাসনে বসেছেন – তখন তারা রাজরাণী হতে দ্বিধা করেন নি । আবার যখন বালী এসে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে সিংহাসনে বসলেন – তখন তারা সহজেই বালীর প্রিয়তমা পত্নী হলেন । শেষে বালীর মৃত্যুতে তিনি এতটা শোককাতর হলেন যে, সহমরণ বাসনাও করেছিলেন । কিন্তু অল্পকাল পরে বালীর মৃত্যুর দুমাসের মধ্যেই আবার সুগ্রীবের অঙ্কলক্ষ্মী হলেন । এই দিক থেকে তারা রহস্যময়ী । সুগ্রীবের তাঁর প্রিয় সম্বন্ধ ছিল । ভালবাসতেন তাঁকে । অনার্য সমাজে দেবর পতি হওয়ায় নিন্দা নেই । বিধি আছে, কাজেই সুগ্রীবকে স্বামী হিসাবে গ্রহণের মধ্যে কোন অসামাজিকতা নেই । যদিও পুত্র অঙ্গদের ভাল লাগেনি, বোধ হয় কোন পুত্রের-ই লাগে না । তারা স্বামীকেও ভালবাসতেন, তার মঙ্গলের জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন, রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সঙ্গে বিবাদ না করতে বলেছেন । মনে হয় এতে ছলনা নেই, সবই অকপট । কৃত্তিবাস বাল্মীকির সূত্র ধরেই তারা চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু একটি বিশেষত্ব দিয়েছেন তা রামের প্রতি তারার অভিশাপ ।

আমি অভাগী দিনান্ত না হইবে খণ্ডন ।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥
সীতার কারণে তুমি হারাইবে প্রাণ ।
এ জন্মের মতো দুঃখে না পাইবে ত্রাণ ॥
*** *** ***
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে ।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন ।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥

মন্দোদরীর যে পরিচয় দিয়েছেন বাল্মীকি, তা এই দানবময় ও হেমা অপ্সরার রূপবতী কন্যা মন্দোদরী রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইন্দ্রজিত তাঁর পুত্র। সীতাহরণকে মন্দোদরী সমর্থন করেন নি। সীতাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর শোকার্তা মন্দোদরীর বিলাপের মধ্যে এটি পাওয়া যায়। স্বামীর বহু নারী কামনা ও লাম্পট্য সম্বন্ধেও বিলাপ, বহু সতী নারীকে বিধবা ও নির্যাতনের জন্য যে অভিশাপ সঞ্চিত হয়েছিল, তাতেই রাবণের মৃত্যু।

কৃত্তিবাস মন্দোদরীকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে রাবণের দুষ্কার্যে বাধা দিতে দেখা যায় মন্দোদরীকে। সর্বাপেক্ষা দুটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সীতার প্রতি অভিশাপ ও রামের কাছে অবৈধব্য বরলাভ। সীতা স্বামীদর্শনে যাচ্ছেন। সকলে প্রণাম করছে তাঁকে, শোকার্তা মন্দোদরী-ও প্রণাম করে অভিশাপ দিলেন –

মন্দোদরী বলে শুন জনক নন্দিনি।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরী সহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে॥
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টে তোমাকে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ হবে না খণ্ডন॥

সীতাহরণে দুঃখিতা এই মহীয়সী নারীর এমন কঠোর শাপ বিনাপরাধে সীতাকে দেওয়ার মধ্যে যদি-ও হীনতা আছে ও সর্বাংশে বেমানান - তবু অস্বাভাবিক নয়, শোকার্তা নারী শোকের হেতুর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। নিজের সৌভাগ্যের অবসান ও অপরের সৌভাগ্যের উদয় – সম্বন্ধে ঈর্ষাতুর হওয়া-ও অস্বাভাবিক নয়। মনে হয় এই অভিশাপের আর-ও একটা হেতু আছে। রামভক্ত কবি কৃত্তিবাস - রামচন্দ্র সীতাকে যে কঠোর নিষ্ঠুর অমানবিক ভর্ৎসনা এবং চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে পরিত্যাগের ঘোষণা করেছিলেন, রাম চরিত্রের এই কলঙ্ক মোচনে - সতী মন্দোদরীর অভিশাপ একটি বিশেষ হেতু তৈরী করে থাকবেন কৃত্তিবাস – এমন অনুমান করা যায় না কি ?

রাবণ বধের পর মন্দোদরী রামচন্দ্রকে প্রণাম করলে তাকে ঠিক চিনতে না পেরে

সীতা বলি রামচন্দ্র ভাবিয়া তাহারে ।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্বাদ করে ।।
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ ।
হেন বর দিলে কেন কমল লোচন ।।
চন্দ্র সূর্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে ।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ।।

তাহলে মন্দোদরীর বৈধব্য বিমোচনের উপায় কী ? উপায় হল । যে পর্যন্ত স্বামীর চিতা নির্বাপিত না হয় সে পর্যন্ত স্ত্রীর বৈধব্য হয় না — এই বিধান । রাবণের চিতা অনির্বাণ । রাম বললেন —

রাবণের চিতা রহিবে সর্বথা
চিরকাল রবে আয়তে ।।

রাবণের চিতা বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে অবৈধব্যের প্রতিশ্রুতি থাকলেও চিরন্তন জ্বালার দিকটি অধিকতর মর্মদাহী ।

রামচন্দ্র রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র । রামকে নিয়েই রামকথা বা রামায়ণ। রামায়ণ গ্রন্থারম্ভে নারদ বাল্মীকি সংবাদে — রামচরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য নারদের মুখে শুনেছিলেন বাল্মীকি — তার মধ্যেই রামচন্দ্রের চরিত্রের মূল তত্ত্ব নিহিত ।

নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান ধৃতীমান বশী ।
বুদ্ধিমান নীতিমান বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রু নিবর্হণ: ।।
... ... ... ...
ধর্মজ্ঞ: সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রত: ।
যশস্বী জ্ঞান সম্পন্ন: শুচির্বশ্য: সমাধিমান্ ।।
... ... ... ...
স চ সর্ব গুণোপেত: কৌশল্যানন্দবর্ধন: ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবান ইব ।।

বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শন: ।
কালাগ্নি সদৃশ: ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসম: ।।

(আদি ১।৮-১৮)

বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে এই সর্বগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথাই বিস্তার করেছেন । 'ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ ' রূপটি রামচরিত্রের অক্ষয় বীজ – এই বীজের চরম বিকাশ – রাজা রামের প্রজা হিত ব্রতের মধ্যে । যথা বুদ্ধি যথা শাস্ত্র যাকে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, বুঝেছেন কোন কিছুর বিনিময়ে ভয়ে বা লোভে তা থেকে বিচ্যুত হননি তিনি । তার ফলে রামচরিত্র ঘিরে নানা রহস্য – বিশেষত: বালিবধ, শম্বুক বধ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও সীতা নির্বাসন প্রমুখ ঘটনাবলীর মধ্যে প্রকটিত হয়েছে । তা নানা দিক দিয়ে কেবল বিস্ময়কর নয় বিভ্রান্তিকরও এবং তার সামঞ্জস্য করা কঠিন । সত্য ও ধর্ম বলতে তিনি যে বস্তুকে গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বপুরুষদের অভ্যস্ত বংশ মর্যাদা রক্ষা রাজার কর্তব্য । নিজের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা, এমন কি প্রাণাধিকা সীতা সম্বন্ধেও তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর সত্যনিষ্ঠতা ও প্রজা কল্যাণে তথা নিয়োজিত । রাজার চরিত্র আদর্শ চরিত্র – সর্ব দোষ বর্জিত এমন একটা ধারণা তাঁর প্রতি আচরণে পরিস্ফুট ।

বাল্মীকি যে আদর্শে রামচরিত্র বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস কদাচ সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি । ব্যক্তিগত রুচিতে যা পছন্দ করেনি, কখনো কখনো তার মন্তব্যও দিয়েছেন । কিন্তু বর্ণনার অন্যথা করেন নি যেমন বালি বধের পর –

কৃত্তিবাস পন্ডিতের ঘটিল বিষাদ ।।
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ ।।

রামচরিত্রের বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই বাঙালী চরিত্রের আবেগের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে – শোকে ও বিরহে । সীতাহরণের পর রামের ব্যাকুলতা বর্ষা শরতে বিরহের চিত্র, মায়া সীতা বধের পর বা লক্ষ্মণ শক্তিশেলের পর রামের আর্তি, সীতা বনবাসের পর শোক নির্বেদ সর্বত্রই বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন কৃত্তিবাস – কিন্তু মাত্রা ও রং দিয়েছেন বাঙালী মানসিকতার । সীতা বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলে লক্ষ্মণ শুনেছে রাম তিন দিন রাজকার্য না করে অন্ত:পুরে শোকমগ্ন ছিলেন । লক্ষ্মণ রামকে বললেন – যে লোকপ্রবাদের ভয়ে রাজার কর্তব্যরূপে সীতা বিসর্জন দিলেন তবে এখন যদি ঘরে

বসে রাজকর্তব্য অবহেলা করে কাঁদেন — তাতে সাধুসংকল্প ব্যর্থ হবে ।

কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা অন্যরূপ । লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরলে - রাম শোকে ভেঙে পড়লেন —

শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা ।
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয় ।
বর্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ।।
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি ।
একলা আসিবে বনে কাহার সংহতি ।।
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার ।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ।।

শোকার্ত রামকে জানালেন যে বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে রেখে এসেছেন ।

লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন ।
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন ।।
***    ***    ***
যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞাদান ।
রাত্রির ভিতরে আনি সীতা তব স্থান ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে ।
বড় লজ্জা হবে পুন: আনিলে সীতারে ।।
সীতা না দেখিয়া ভাই পারি না রহিতে ।
কেমনে সীতার শোক পাশরিব চিতে ।।

তখন তিনভাই যুক্তি করে বিশ্বকর্মাকে ডাকালেন । "স্নাতমন সোনা" দিয়ে স্বর্ণ সীতা বানালেন বিশ্বকর্মা । অবিকল সীতা ।

সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর ।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ।।
এক দৃষ্টে চাহেন সোনার সীতা মুখ ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় দুখ ।।

***  ***  ***

সাত রাত্রি বসি রাম আইলা বাহির ।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ।।

স্বর্ণসীতার কথা বাল্মীকিও বলেছেন । অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্মিনীর সহ সঙ্কল্প করতে হয় — একপত্নী ব্রত, রাম তার জন্য স্বর্ণসীতা নির্মাণ করেন । কিন্ত কৃত্তিবাসের স্বর্ণসীতা রাজকর্মের জন্য নয়, নিজের অন্তরের প্রয়োজনে ।

এই জাতীয় কিছু বাঙালী মানসিকতাজাত অনুরঞ্জন ছাড়া কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামচরিত্রের আদর্শ থেকে কোথাও বিচ্যুত হন নি ।

ভরতচরিত্র এত অসাধারণ যে মর্ত্যমানুষের কাছে কেবল কল্পনা লভ্য । রাজা দশরথ বলেইছিলেন যে রাম থেকেও ভরত অধিকতর ধার্মিক —

রামাদপি হিতং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্ ।    (২।১২।৬১)

বাল্মীকি রামায়ণে এই চরিত্র সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত । রামচরিত্রে কখনো কখনো উষ্মা ও বেদনা আছে । জনপদের বাহিরে প্রথম রাত্রিতে তৃণশয্যায় শুয়ে রাম — দশরথের কামুকতা - কৈকেয়ীর লোভ - ভরতের ভাগ্য ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । আবার চতুর্দশ বৎসরান্তে প্রত্যাবর্তনের পর হনুমানকে পাঠিয়েছিলেন — দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর ভরতের মনে কোন লোভ বা আসক্তি জন্মেছে কি না তা জানতে । অবশ্য লোকচরিত্র অভিজ্ঞ রামের এমন প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় এবং তার উদ্দেশ্যও মহৎ কিন্তু ভরত সম্বন্ধে রামের মনে সামান্য সংশয় যে ছিল না — এসব দ্বারা এই কথাই মনে হয় না কি ?

কিন্তু ভরত চরিত্র সর্বথা এই জাতীয় মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্মল । রামায়ণে কেবল রামায়ণে কেন বিশ্বের যাবতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যও বোধ করি ভরতের মতো এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দ্বিতীয় চরিত্র নেই । বিনা অপরাধে পিতা, মাতা, রাম-লক্ষ্মণ পরিবার পরিজন সর্বসাধারণ সকলের কাছে নিন্দা-সন্দেহ সংশয়ভাজন হয়েছেন । পিতা তাকে পুত্রের পারলৌকিক থেকে বঞ্চিত করেছেন । রামচন্দ্রের বন-বাস, রাজ্য ত্যাগের মধ্যে পিতৃসত্য পালনের ধর্মনির্দেশ ছিল, কিন্তু ভরত যে চতুর্দশ বর্ষ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন — সকলের শত অনুরোধেও পিতৃ আদেশে প্রাপ্ত সিংহাসনের

দাবী অগ্রাহ্য করেছিলেন – জ্যেষ্ঠের ন্যাসী হয়ে রাজধানীর বাহিরে থেকে পাদুকা বসিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কেবল আপন বিবেকের নির্দেশে। একমাত্র শত্রুঘ্ন ছাড়া - কৌশল্যা, সীতা, লক্ষ্মণ, রাজন্যবর্গ, প্রজাবর্গ, জনগণ এমন কি রামচন্দ্র তাকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং পলে পলে পদে পদে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তিনি নিজের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভরত চরিত্র অনন্য। পিতা দশরথ তাঁকে রামের অপেক্ষাও ধর্মে বলবত্তর বলেছিলেন। চণ্ডাল রাজসরল চিত্ত গুহক-ও ভরতের কর্ম দেখে বলেছিলেন – ধন্য, ধন্য ভরত - যে রাজ্য লাভের জন্য মানুষ সারা জীবন সংগ্রাম করে, তপস্যা করে সে রাজ্য অযত্নে পেয়েও ভরত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে।

ধন্যস্ত্বং ন তুয়াতুল্য পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নোদাগতং রাজ্যং যস্ত্বংত্যক্তুমিচ্ছতি ॥

মূলানুসরণ করেও কৃত্তিবাস দুইটি স্থলে ভরতের চরিত্রে নতুনত্বের রং দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র রাম তথা রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেছিলেন যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাক্ষস-বধ করতে। দশরথ তাদের বদলে প্রতারণা করে রামলক্ষ্মণ বলে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠিয়েছিলেন। সরযূর তীরে বন। সেখানে এসে বিশ্বামিত্র বললেন যে দুটি পথ আছে তাঁর আশ্রমে যাবার – এক পথে যেতে সময় লাগে তিন প্রহর আর একটিতে তিন দিন। তবে তিন প্রহরের পথে রাক্ষসের ভয় আছে – তাড়কা রাক্ষসী মানুষ খায় –

কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মনে।
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন ॥
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন প্রয়োজন।

কথা শুনেই বিশ্বামিত্র বুঝলেন – এ রাক্ষসত্রাস রাম নয়, সমদর্শন ভরত। ভরতের উত্তর বিবেচনাপ্রসূত কিন্তু প্রত্যাশিত অপরোচিত নয়। রাক্ষস নিধনকারী রামচরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভরতকে যে খানিকটা ছোট করা হল – সেটি বোধ হয় কৃত্তিবাস কবি লক্ষ্য করেন নি।

আর একবার লঙ্কাকাণ্ডে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে মূর্ছিত। হনুমান গন্ধমাদন পর্বত খণ্ড মাথায় করে আসছেন। সূর্যোদয় হলে লক্ষ্মণের বিপদ - কিন্তু তার শঙ্কা নেই কারণ সূর্যকে বগলে আটকে রেখেছেন হনু। রাম মাঝে মধ্যেই ভরতের কথা

বলেন । কী রকম শক্তিমান ভরত তা দেখতে সাধ হল হনুমানের । নন্দীগ্রামের শ্রীরামের পাদুকার উপর ছায়া পড়তেই, ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে বাটুল নিক্ষেপ করলেন আকাশচারীর দিকে – আহত ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন হনুমান, পরিচয় হল । সীতাহরণাদি, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল শুনে কাঁদতে লাগলেন ভরত সসৈন্য সৈন্য নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন - কিন্তু রামের নির্দেশ নেই । পর্বতটা নিয়ে যেতে হবে শীঘ্র কিন্তু হনুমান দুর্বল হয়ে পড়েছেন - তাকে যে আকাশে তুলে দিতে হবে । তৎক্ষণাৎ তীর মেরে ভরত পর্বতসহ আকাশে তুলে দিলেন ।

ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান ।
আমা সহ বাণেতে তুলিনা গিরি খান ।।

লক্ষ্মণচরিত্র রামায়ণে ক্ষাত্রতেজ ও কর্মের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । নিত্য সহচর লক্ষ্মণকে রাম বলতেন "প্রাণ-ইবাপরঃ" – তার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ । বাঙালীর জীবনচর্যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য আদর্শ হিসাবে সীতারাম অপেক্ষা সৌভ্রাত্র বিষয়ে রামলক্ষ্মণ – কথাটি সমধিক প্রচলিত । বস্তুতঃ সীতা ছাড়া রামকে ভাবা যায়, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রাম অকল্পনীয় ।

অন্যায় অধর্ম যেই করুক পিতা হলেও লক্ষ্মণের কাছে অমার্জনীয় । কৈকেয়ীর কাছে সত্যবদ্ধ দশরথের রাম নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যদানের প্রস্তাবে লক্ষ্মণ পিতাকে বন্দী ও হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলেন । "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্ত-মানসম্ ।" (২।২১।১৯) কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি এতো গভীর যে তাঁরই নিষেধে অগ্রসর হতে পারেন নি । কৈকেয়ী দশরথ কারো দোষ দেখেন নি রাম নির্বাসন ব্যাপারে বলেছিলেন 'দৈব' । ষোল আনা ক্ষাত্র শক্তিতে সমুজ্জ্বল পৌরুষের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ উপহাস করে রামকে বলেছিলেন –

বিক্লবোবীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে ।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবংপর্যুপাসতে । (২।২৩।১৬)

যখন রাম ও সীতার বনে যাবার কথা স্থির হল তখন রাম লক্ষ্মণকে বললেন অযোধ্যায় থেকে কৌশল্যা ও সুমিত্রার দেখাশুনা করতে । এবার ভেঙে পড়লেন লক্ষ্মণ কান্নায় । রামের পা জড়িয়ে ধরে বললেন – আমাকে নিয়ে চল দাদা । অনুচর হয়ে সঙ্গে থাকব

তোমাদের । "ঐশ্বর্যং চা পি লোকনাং ন কাময়ে তুয়া বিনা ।"
আর একটি উক্তির কথা মনে পড়ে । রাম-সীতা লক্ষ্মণকে যমুনাতীরে রেখে অযোধ্যা ফিরে যাচ্ছেন অন্যান্য সুমন্ত্র । কার কী বার্তা জানতে চাইলেন তিনি । লক্ষ্মণ বললেন — দশরথের মধ্যে কোন পিতৃত্ব গুণ নেই, আমার ভ্রাতা, ভর্তা বন্ধু সবই রাম —

অহং তাব-মহাপ্রাজ্ঞে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে ।
ভ্রাতা ভর্তা বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥ (২।৫৮।৩১)

সীতাহরণের পরে শোকার্ত রামকে কখনো বন্ধুর মত উৎসাহ দিয়ে কখনো অভিভাবকের মতো জোর করে রক্ষা করেছেন, লঙ্কা সমরেও তার শৌর্য অসাধারণ । সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বিসর্জনের মতো একান্ত অনভিপ্রীত কর্মের ব্যাপারেও গভীর দুঃখের সঙ্গে রামের কঠোর আদেশ নির্বিবাদে পালন করেছেন ।

ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির স্বরূপের পার্থক্য দেখাতে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্যটি করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য — "ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ । কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ ভক্তির অনুব্যঞ্জন জীবিকার সন্ধান ।" (ন)

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণচরিত্র চিত্রণে বাল্মীকির পুরাপুরি অনুসরণ করেছেন — বাংলা ভাষাধ্যমের হেতু অনুবাদের সুর মূলের সমতানে ধ্বনিত না হলেও বিষয়বস্তু সর্বতোভাবে মূলানুগত এবং একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে কোন লক্ষণীয় অতি-রঞ্জন বিহীন কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ চরিত্রই বাল্মীকির সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদ ।

বানর চরিত্রের মধ্যে বালি ও সুগ্রীব চরিত্র মোটামুটি মূলানুগ । অঙ্গদ চরিত্রে রায় বার অংশে অঙ্গদের সাহস, রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সংযোজন করেছেন কৃত্তিবাস ।

হনুমান, কেবল বানর চরিত্রের মধ্যে নয়, বোধ হয় রামায়ণের সব চরিত্রের মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস, শক্তি বুদ্ধি কর্মোদ্যম ও দক্ষতার মূর্ত প্রতীক । দেবারতির এমন বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ চরিত্র, এমন তুল্য বিশ্বাসের জীবন্ত মূর্তি — ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্যে বর্ণিত দাস্যভক্তির সমস্ত চরিত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । বাল্মীকির বর্ণিত

অংশ ছাড়া কৃত্তিবাস যে সব মৌলিক ও বাল্মীকির রচনা ভিন্ন অন্যান্য সূত্র থেকে নানা নতুন সংযোজন করেছেন — তার মধ্যে হনুমানের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ।

রামায়ণ বিশ্লেষণ পর্যায়ে কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের নতুন ও মৌলিক সংযোজন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে গন্ধমাদন পর্বতাদি থেকে বিশল্য-করণী ওষুধ সংগ্রহে, মহীরাবণ বধে, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে, নীলকমল আহরণে, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়নে — সর্বোপরি নিজের বক্ষবিদীর্ণ করে অস্থিতে রামনামের স্বাক্ষর সম্প্রদানে হনুমানের যে চরিত্র কৃত্তিবাস রচনা করেছেন তার চমৎকারিত্ব ও স্বাদুতা, সরসতা ও কৌতুকময়তা অসাধারণ ।

বাল্মীকির রামচন্দ্র হনুমানকে বলেছিলেন — তোমার এক একটি উপকারের জন্য প্রাণ দিতে পারি কিন্তু এত উপকার মোর আমার প্রাণ একটি কাজেই ঋণী রইলাম —

একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামিতে কপে ।
শেষস্যোহোপকারাণাং ভবাম ঋণয়া বয়ম্ ॥ (৭।৪০।২৬)

মহাপ্রস্থানের সময় রামচন্দ্র হনুমানকে বলেছিলেন — তুমি চিরজীবী হয়ে আমার কথা প্রচার করবে । হনুমানও বলেছিলেন

যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতী পাবণী ।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনু-পালয়ম্ ॥ (৭।১০৮।৩৫)

কিন্তু কৃত্তিবাসের রামের উক্তি আরও আন্তরিক ও মহত্তর —

যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে ।
চন্দ্র সূর্য যতকাল জগতে প্রচারে ।
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর ।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হবে চরাচর ॥
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গ বাস ।
তোমার যে গুণ শুনি - এই অভিলাষ ॥
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে ।

সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রি দিনে ।।
হনু প্রতি বলেন শ্রীরাম কমল লোচন ।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন ।।
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির ।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ।।

রাক্ষসগণের মধ্যে বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিতাদির চরিত্র মূলানুগামী । রাবণ চরিত্রে কৃত্তিবাস নতুন ব্যঞ্জনা এনেছেন । রজস্তম গুণ প্রধান, ব্রহ্মার বরে মহাশক্তিধর রাবণ দিগ্বিজয় করেছেন । অপরিমেয় বাহুবলের সঙ্গে সীমাহীন নারী-ভোগ পিপাসা তার চরিত্রের মূল কেন্দ্রে স্থিত । কৃত্তিবাস অকৃপণ ভাবে এই রাবণের বর্ণনা করেছেন — তার শক্তি ও কামচারিতা তৃপ্তিহীন নারীভোগলোলুপতা । তার ঐশ্বর্য, কূট বুদ্ধি, সন্তান স্নেহ, দোষ গুণ সবই বর্ণনা দিয়েছেন । হনুমান লংকায় গিয়ে রাবণের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন — কামুক রাবণের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । অঙ্গদ রায়বারের পর অঙ্গদও একদিনে যেমন রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অপমান করেছিলেন, তেমনি রাবণের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধও হয়েছিলেন । ভক্তিরসাপ্লুত কবি তরণী সেন অতিকায়াদিকে কেবল নয় এ হেন রাবণকেও রামের ভক্তে পরিণত করেছেন । আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বীরবাহুর ভক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করে লিখেছেন — তৎপরে রাবণের মুখে —

জন্মিয়া ভারত ভূমে আমি দুরাচার ।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার ।।
অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময় ।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাবণ এক দৃষ্টে রয় ।।

রামের নিকট এই মিনতি করিলে অনুতপ্ত জগাই-মাধাই এবং নবোত্তী চৈতন্য প্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন — তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক । লেখক সেই অত্যন্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে রাবণের লংকা ভুলিয়া তাহাকে ভারত ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ।[ব] অবশ্য সকল সংস্করণে এই অংশ নেই । কারণ পাঠান্তর বিভিন্ন সংস্করণে বিপুল ।

রাবণ ছিলেন রাজনীতি বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞ ব্যক্তি । ভূপতিত রাবণের কাছে রাম রাজনীতি শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করে লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে ।

লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
কোন নীতি সংসারেতে রাম অগোচর ।।
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে ।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে ।।
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ ।
দয়া করে একবার দিন দরশন ।।
শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান ।।

উপদেশ বিশেষ কিছু নয়, চিরপ্রচলিত দুটি নীতিকথা – শুভস্য শীঘ্রং –

করিতে উত্তমকর্ম বাঞ্ছা যবে হবে ।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ।

আর অশুভস্য কালহরণম্ ।।

শূর্পনখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে ।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ।।
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে ।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ।।
***  ***  ***  ***
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে ।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ।।

মনে হয় এই অংশটি মহাভারতে শরশয্যায় পতিত যুধিষ্ঠিরাদির উপদেশ অংশ দ্বারা প্রণোদিত । যাহোক ভক্তিবাদের বৈরীভাবের সাধনায় বৈষ্ণবীয় ধারা দ্বারা রাবণ চরিত্র প্লাবিত ।

## বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ

প্রাচীন সাহিত্য ছিল হস্তলিখিত পুথি নির্ভর। কাজেই সেখানে পাঠভেদ ও পাঠান্তর একটি অনিবার্য স্বাভাবিক ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম ও গৌড়ীয় – এই তিনটি পাঠে বা পাঠান্তরে বাল্মীকির রামায়ণ বিভক্ত। বাংলা রামায়ণ গৌড়ীয় পাঠ অবলম্বনে রচিত।

কৃত্তিবাসের কোন সঠিক পাঠ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর তো আছেই। শ্রীরামপুরের প্রেসে মুদ্রাংকিত হবার পর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। বটতলার সংস্করণে পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার সংশোধন করেছিলেন, সেই ধারায় বহু লেখক গায়কের সংস্কারে ও সংশোধনে – বর্তমান প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখ্যত, ভাষার দিক থেকে একেবারে আধুনিক রচনা। প্রচলিত সেই সংস্করণকে অবলম্বন করেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের আস্বাদন ও বিচার।

বর্তমান তৃতীয় অধ্যায়ে কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের পার্থক্য কোথায়, আংশিক পরিবর্তন, পরিবর্জন, নতুন সংযোজন কোথায় কিভাবে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা হয়েছে। প্রস্তুত অংশটা প্রধানত: বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সেই বৈসাদৃশ্যের পুনরুক্তি মাত্র।

(১) কান্ডের নামকরণে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর – বাল্মীকি এই কান্ডনামায় কৃত্তিবাস বালকে আদি কান্ড ও যুদ্ধকে লংকাকান্ড করেছেন। তাছাড়া – অন্যান্য কান্ডে একটি 'আ' কার যুক্ত হয়েছে – আরণ্য কান্ড, সুন্দরা কান্ড, উত্তরা কান্ড।

(২) গ্রন্থারম্ভেও উভয় কবির বৈসাদৃশ্য আছে। বাল্মীকি নারদ সংবাদ মূল রামায়ণের আরম্ভ। কৃত্তিবাস সুরু করেছেন বৈকুন্ঠে নারায়ণের চতুরংগ প্রকাশের কথা বলে।

(৩) কৃত্তিবাসের নতুন যেসব কাহিনী সংযোজন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – বাল্মীকির পূর্ব জীবন রত্নাকর কথা, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, অজ বিলাপ, তরণী সেন কাহিনী, মহীরাবণ-অহিরাবণ বৃত্তান্ত

রাবণের চণ্ডীপাঠ, রামের অকাল বোধন, রাবণের মৃত্যুবাণ প্রসঙ্গ, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি ।

(৪) প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক নতুন কথা আছে । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষ্মণের চতুর্দশ বৎসর অনাহার-অনিদ্রার সাক্ষ্য, শিব বিবাহ, লঙ্কার উৎপত্তি, গরুড় পবনের যুদ্ধ, দেবগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের কালে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব, রামের জন্য অযোধ্যায় বিশ্বকর্মা কৃত অশোকবন নির্মাণ, সীতার পরিবাদ বিষয়ে রজক জামাতার অভিযোগ ও রাবণের চিত্রাঙ্কণ, গন্ধমাদন সহ হনুমানের ভরতের নিকট গমন, সূর্যকে হনুমানের বগল চাপা, সীতার পাতাল প্রবেশের পর শোকার্ত লবকুশকে তিন বুড়ী – কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার ও তিন খুড়ার ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের সান্ত্বনা ইত্যাদি ।

(৫) কাহিনী বিন্যাসে ক্রমভঙ্গের নিদর্শন – মূলের কুবেরের বৃত্তান্ত ও পরে রাক্ষসদের বিবরণের পরিবর্তন । রম্ভা রাবণ বৃত্তান্ত মূলে আছে দেবতাগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে কৃত্তিবাস বহু পূর্বে তা বলেছেন ।

স্বর্ণসীতা নির্মাণের কথা কৃত্তিবাস বলেছেন সীতা নির্বাসনের ৭ দিন পরে বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে ইত্যাদি ।

(৬) নাম বিভ্রাটও আছে – পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা কৃত্তিবাসের কলমে হয়েছে বিশ্রুবা। মূলে বিশ্রবার পত্নীর নাম দেববর্ণিনী – কৃত্তিবাস বলেছেন লতা, মূলে কৈকসী (নিকষা) পিতার নাম সুমালী কৃত্তিবাস লিখেছেন মাল্যবান ইত্যাদি ।

(৭) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উভয় কবির মানসিকতার প্রভেদ । কৃত্তিবাসের বাঙালী মনের কোমলতা বাল্মীকির বৈদগ্ধ্যকে গ্রহণ করতে পারেনি । মহোরস্ক, দীর্ঘবাহু মহেষ্বাস বীর রামচন্দ্র হয়েছেন কৃত্তিবাসের হাতে দূর্বাদল শ্যাম – "নবনী জিনিয়া দেহ অতি সুকোমল ।" রাম হয়েছেন ভক্তবৎসল । অতিকায় ও তরণীসেনের যুদ্ধে । দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন – "রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধকাণ্ডে ঠিক চৈতন্য ও নিত্যানন্দের আদলে গঠিত হইয়াছেন । ••• ••• পাঠক বাঙালীর যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ বস্তু তাহার নমুনা কোন ইতিহাসেই পাইবেন না । যেমন এইখানে পাইবেন । তারপর

তরণী গুন্ডিচা পার হইয়া প্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন, তাঁহার অঙ্গ কদম্ব কোরক-বৎ কন্টকিত হইয়া উঠিল।

রামের সর্বাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে।
ব্রহ্মাণ্ড এক এক লোমকূপের ভিতর।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী।

বীরবাহু নূপুর পায় দিয়া যুদ্ধে যাইতেছেন। কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে সংকীর্তনে নাচিতে হইবে না। ••• ••• অন্তর তেজের সাক্ষাৎ বিগ্রহ স্বরূপ রাবণের মূর্তি যে ভক্তির উপাদান দিয়া নবীন কোমল ভাবে গঠিত হইতে পারে ইহা কোন কবি শিল্পী বোধহয় ইতিপূর্বে ধারণাও করিতে পারিতেন না। ••• ••• এ যেন কামান ভাঙিয়া ফুল ধনু সৃষ্টি করা হইয়াছে, লৌহদণ্ডকে মঞ্জরিত করিয়া সপুষ্প লতিকায় পরিণত করিয়াছে।" (ন)

সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভিন্ন অংশে কাহিনী বিস্তারে, প্রকৃতি বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, সর্বত্র — কবির ভক্তিরসাপ্লুত বাঙালী মন এমন স্বাতন্ত্র্য তথা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে — যাতে বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তরিকতার দিক থেকে বাল্মীকির অনুবাদ অপেক্ষা কৃত্তি-বাসের নিজের রচনা বলেই গ্রহণ করা যায়। দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে মূল্যবান — "এ রামায়ণ (কৃত্তিবাসী) ও আদি রামায়ণ, ইহাদের মধ্যে যত প্রভেদ, তাহাতে উভয়কে দুইখানি স্বতন্ত্র বহি বলিয়া গণ্য করিলেও অত্যুক্তি হয় না।" (প)

## কৃত্তিবাসের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য বিচার

কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "বাঙ্গালায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে, তবে তাহা এই কৃত্তিবাসের তথাকথিত রামায়ণ। আমি মহাকাব্য বলিতে গ্রীক বা সংস্কৃত আলংকারিকদের সজ্ঞা অনুসরণ করিতেছি না। ইহাতে একটি মহাদেশের, মহা-জাতির, মহাপুরুষের মহীয়সী মহিমার ও মহাবীরের জীবনকাহিনী বাণীরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি।" (ফ)

বাঙালীর জীবন-সমাজ-পরিবার, নিসর্গ পরিবেশ, সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ফুল-ফল, বেশভূষা, পূজা পার্বন, ভোজ্য-পানীয়, উৎসব-আমোদ সবকিছু ভাল-মন্দ নিয়েই কবি কৃত্তিবাস তার রামায়ণ কাহিনী রচনা করেছেন।

বাল্মীকির কাহিনীর কাঠামো ও চরিত্রসমূহের অবয়ব পরিবর্তন না করে তার অভ্যন্তরে ও অন্তরে বাঙ্গালীর শোণিত প্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন ভাব-ভাবনা, মায়া-মমতা, হাসিকান্নাদিতে — নতুন প্রতিষ্ঠা করেছেন । বাঙ্গালীর অদৃষ্টবাদ ও দৈব নির্ভরতা । স্বপ্ন মাধ্যমে জীবজন্তুর গতিবিধি, নৈসর্গিক অবস্থাদি বিচার করে শুভাশুভ বিচারাদির অজস্র পরিচয় রামায়ণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট । কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক ।

১) সুমিত্রার দুর্ভাগ্যের কারণ - (সংস্কার)

বাসি বিবাহের দিন হয় কাল রাতি ।
স্ত্রীপুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি ।।
কাল রাত্রে যে নারীকে করে পরশন ।
সে স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন ।। (আদি)

২) রামচন্দ্রাদির বিবাহে অধিবাস অনুষ্ঠান —

হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে ।
অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে ।।
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে ।
বান্ধিল মঙ্গল সূত্র তাহাদের করে ।। (আদি)

৩) দুর্লক্ষণ দর্শন রামচন্দ্রের —

হাতে ধনুর্বান রাম আসিলেন ঘরে ।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ।।
কাল সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে । (অরণ্য)

৪) বিবাহ অনুষ্ঠান —

সুবর্ণ আসরে বসিলেন রূপবতী ।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ।
*** *** ***
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে ।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ।।

অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ ।
সীতারামে পরস্পর হৈল দরশন ।।
জলধারা নিয়া তারা কন্যা নিল পরে ।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ।। (আদি)

৫) শবদেহ সৎকার –

তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে ।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ।।
শুক্ল বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী ।
সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধী কস্তুরী ।।
নানাবিধ কুসুমের মালা মনোহর ।
যথাস্থানে দিল তার গলার উপর ।।
চিতার উপরে লয়ে করায় শয়ন ।
হেঁটে ঊর্ধ্বে কাঠ দিল অগুরু চন্দন ।। (অযোধ্যা কাণ্ড)

৬) দৈবনির্ভরতা বা অদৃষ্টবাদ –

বিধাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী ।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজি ।।
বিধাতা জানেন ভাল আমার চরিত ।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত ।।
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা ।
বিধাতার দোষে তাই আমার দুর্দশা ।। (অযোধ্যা কাণ্ড)

৭) বধূর বেশভূষা অলংকার —

কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দূর ।
বাল সূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ।।
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে ।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ।।
চঞ্চল নয়নে দিল কাজলের রেখা ।

রামের কার্মুকে যেন গুণ যায় দেখা ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি ।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি ॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
সুবর্ণের কর্ণ ফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কন ॥
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর ।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥

বাঙালীর ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় মুখ্যত: শ্যাম শ্যামাকে কেন্দ্র করে । কৃত্তিবাসে সুস্পষ্টত বৈষ্ণব ও শক্তি প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে । হনুমানাদি রামপক্ষ ছাড়াও লঙ্কায় তরণীসেন প্রমুখের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব মনোভাব এবং রাবণের পার্বতী আরাধনা চন্ডীপাঠ এবং রামের অকাল বোধনাদির মধ্যে শাক্ত ধারার প্রকাশ । অবশ্য এই আখ্যান কৃত্তিবাসের মৌলিক নয় জৈমিনি ভারত থেকে সংগৃহীত ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখ্যত: পয়ার ছন্দে রচিত । প্রায় ষোল আনাই ৮ + ৬ এই ১৪ অক্ষরের পয়ার। মাহাত্ম্যাদি ও বিশেষ আবেগ প্রকাশের সময়ে কেবল কয়েকটি স্থানে নাচাড়ি বা ত্রিপদী দেখা যায় । ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী — দুই রকম আছে । যেমন —

১) নমস্তে সর্বানী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া ।
অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া ॥

২) রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি
দন্ড কমন্ডলু করি হাতে ।
স্বর্গে নাচে দেবগণ মর্ত্যে নাচে মর্ত্যজন
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥

কৃত্তিবাসের ভাষা যেমন সরল ও অনর্গল তেমনি সহজ সরল যেন স্বত: উৎসারিত তার উপমা । উপমানগুলি কখনো সংস্কৃত বা পূর্বকবিদের ভান্ডার থেকে আহৃত কখনো বা কবির অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষতা জাত যেমন –

ক) সীতার রূপ বর্ণনা –

নয়ন খঞ্জন তার দশন মুকুতা ।
গমন মন্থর যেন জিনি গজ মাতা ॥
ভ্রমর জিনিয়া যেন কবরী বিরাজে ।
মল্লিকা মালতী জুতি বেড়া তার পাশে ॥

খ) রাবণের হাসি —

কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখ হাসে ।
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ।

এমন অনেক আছে ।

প্রবাদ, প্রবচন, গূঢ়ার্থক বাকগুচ্ছের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভান্ডার কৃত্তিবাসের রামায়ণ – যেমন – কালনেমির লঙ্কাভাগ, রাবণের চিতা, কাঠবিড়ালীর সাগর বন্ধন, ঘরের শত্রু বিভীষণ, বানরের গলায় মুক্তামালা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, রামে মারিলেও মারিবে- রাবণ মারিলেও মারিবে, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস (রাবণ), রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি রচনা, ধনুর্ভাঙ্গা পণ, দেবর লক্ষ্মণ, ধর লক্ষ্মণ, রামরাজত্ব, লঙ্কাকান্ড, কোন বুদ্ধি খাটিবে না ঘরপোড়ার কাছে, সুজনের বন্ধু রাম দুর্জনের যম, করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ, মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী, ধন পাইলে তুষ্ট যেন গরীবের মন, পিঁপড়ার পাখা ওঠে পুড়িবার তরে, বামন হইয়া চাঁদে বাড়াইলি হাত, দাঁতে কুটা, গলবস্ত্র, জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালা, সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল ইত্যাদি ।

এ বিষয়ে সংশয় নেই যে প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণটি – কীর্তিবাস কবি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত থাকলেও তাঁর ভাষা, বিষয়বস্তুর বিন্যাস অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রচনার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই । অতি জনপ্রিয়তার খেসারত দিতে দিতে বহু লিপিকার, গায়ন, ও পন্ডিত জয়গোপালের মত পন্ডিতের হাতের ছোঁয়ায় একেবারে

নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। শত শত বৎসরের ভক্ত ও রসিক বাঙালীর হৃদয়ের স্পর্শে কল্পনার কলমে, গীতের সুধায় – বর্তমান রামায়ণ একদিক দিয়ে বাঙ্গালী জাতির সমবেত রচনা। গঙ্গার ধারার মধ্যে যেমন নিয়ত বিভিন্ন উপধারার জলস্রোত মিশে গিয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করে, নতুন বাঁক ও তরঙ্গ সৃষ্টি করে কিন্তু তাতে গঙ্গা-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব করে না – কৃত্তিবাসী রামায়ণ গঙ্গাও এমনি সর্বযুগের সকল বাঙালীর মানস রসে পুষ্ট এক অনবদ্য অফুরন্ত পবিত্র ধারা। প্রক্ষেপ, সংযোজনাদি দ্বারাও বাংলা সাহিত্যে – কৃত্তিবাসের রামায়ণ – এই ধারাবাহিকতার অব্যাহত গতির জন্যই বাঙ্গালীর - অনুবাদ সাহিত্যে রামকথা সুরধুনীর চিরন্তন পতিত পাবনী গঙ্গা। বাঙ্গালী হৃদয়ের সহজাত ভক্তির চন্দনে গড়া ভক্তবৎসল রামচরিত কথা।

## তথ্যসূত্র *


ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ (উত্তরা কান্ড) - সম্পাদক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।

খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্দ্ধ – সুকুমার সেন ।

গ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৮ ভাগ, প্রথম সংখ্যা (১৩১৮) ।

ঘ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২০ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (১৩২০)

ঙ) সাধনা, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক, ১৩০১, কবি কৃত্তিবাস, সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

চ) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮ ।

ছ) সাহিত্য সংহিতা, ৮ম খন্ড, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৪ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

জ) সাধক, ১ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২০, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঝ) শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঞ) মাসিক বসুমতী, ১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র : ১৩৩৭ ।
কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ট) প্রবাসী, ৬১ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬৮ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঠ) কৃত্তিবাস ও গৌড়েশ্বর প্রবন্ধ – কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, পৃ: ১৩১ ।

ড) ১৩৭১ সালে ফুলিয়ায় স্মরণোৎসবে সভাপতির ভাষণ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, পৃ. ২৬২ ।

ঢ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের যাবতীয় উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত রামায়ণের তৃতীয় মুদ্রণ থেকে ।

ণ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তর কান্ড) - সম্পাদক, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।


* এর সাথে পরিশিষ্ট সংযোজনী পৃষ্ঠা ২০৭ দ্রষ্টব্য ।

ঙ) গ্রন্থান্তরে এই পয়ার পঞ্চকের পাঠান্তরে এই চতুঃশ্লোকী আছে । এটি অধিকতর সংহত ।

আদিকান্ডে রাম জন্ম বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যা কান্ডে রাম যায় ছাড়ি রাজ্য ভার ।।
অরণ্য-কান্ডেতে সীতা হরিল রাবণ ।
কিষ্কি-ধ্যাকান্ডেতে হয় সুগ্রীব মিলন ।।
সুন্দরাকান্ডেতে হয় সমুদ্র বন্ধন ।
লঙ্কাকান্ডেতে হয় রাবণ নিধন ।।
উত্তরাকান্ডেতে হয় সবকথা শেষ ।
সীতাদেবী করিলেন পাতাল প্রবেশ ।।

খ) প্রাচীন সাহিত্য – রামায়ণ ।

দ) বাল্মীকি রামায়ণ, বালকান্ড - ১৭ ।

ধ) বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড - ১২।১৮-১৯

ন) রামায়ণী কথা – দীনেশচন্দ্র সেন ।

প) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস - দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গদর্শন, ২য় বর্ষ, ১৩০১ ।
কৃত্তিবাস সঙ্কলন গ্রন্থ থেকে আহৃত ।

ফ) কৃত্তিবাস – কালিদাস রায়, বঙ্গশ্রী, ১ম বর্ষ, ২ খন্ড, পৌষ এবং মাঘ ১৩৪৮
কবি কৃত্তিবাস থেকে গৃহীত ।

ব) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খন্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সং, পৃঃ ১৬৪